গৌড়ীয়
বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম, এ,

প্রণীত।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী এম, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত
২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

দীর্ঘকালের ব্যবধানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। আমার ভগ্ন স্বাস্থ্যই এই বিলম্বের প্রধান কারণ। প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর আমার শরীর আরও ভাঙ্গিয়াছে। দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। মুখের কথা অস্পষ্ট হইয়াছে। অপরের সাহায্যেও লেখান দুষ্কর হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় অতি কষ্টে ও বিলম্বে লেখাইয়াছি। কোন রূপে যে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইল তাহার জন্য ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। এই খণ্ডে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধারণ ইতিহাস ব্যতীত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য, রূপ ও সনাতন, রঘুনাথ দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস প্রভৃতি ভক্তগণের জীবন কাহিনী বিবৃত হইল। অনেক দোষ ত্রুটী থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ আমার শরীরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ক্ষমার চক্ষুতে দেখিবেন। এই গ্রন্থ শেষ করিতে শ্রীমান্ করালীকুমার কুণ্ডু ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ব্যোমকেশ সরকার অনেক সাহায্য করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি আমার কন্যা শ্রীমতী কুন্তলার অক্লান্ত যত্ন ও উদ্যম ব্যতীত এই পুস্তক এখনও প্রকাশিত হইতে পারিত না। এখন ভক্ত পিপাসুগণের কথঞ্চিৎ তৃপ্তি হইলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৩৯

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার

সূচীপত্র

গৌড়ীয়
বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্যদেবের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম

শ্রীচৈতন্যদেবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হইলেও, সেখানে তাহার পরিসমাপ্তি নয়। তাঁহার পরেও অনেকদিন পর্য্যস্ত শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ভক্তিপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-দেবের সময়ে এবং তাঁহার পরেও অনেক উচ্চশ্রেণীর সাধক এবং শক্তিশালী ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল রাখিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। বর্ত্তমান পুস্তকে আরও অনেকের বিবরণ দেওয়া হইবে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের বিশেষত্ব এই যে তাঁহাদের সংস্পর্শে ঊষর ক্ষেত্র উর্ব্বর হইয়া উঠে। মহাত্মা বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ে দেশে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহার সংস্পর্শে অনেক শিষ্য নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি ঈশার প্রভাবে পিটার প্রভৃতি নগণ্যলোক অসীম শক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রচারকে পরিণত হইয়াছিলেন।

সেই প্রকার হজরত মহম্মদের স্পর্শে আরব দেশে নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুপ্রাণনায় সেই প্রকার বঙ্গদেশ জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অনুপ্রাণনায় অনেক ক্ষমতাশালী লোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধৰ্ম্ম, সাহিত্য, শিল্পে বঙ্গদেশে নবযুগ আসিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যগণ তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে প্রবল উৎসাহে ভক্তিধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধারা প্রসারিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার তিরোভাবের পরে কতকগুলি শিষ্য পুরীতে থাকিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রথা অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণবধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অপর কতকগুলি শিষ্য নানা স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে ভক্তিধারা প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বৃন্দাবনে আর একটি কেন্দ্র হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত প্রথা অনুসারে সঙ্কীর্ত্তনের সাহায্যে ধৰ্ম্মপ্রচার করিতেন। উত্তরকালে শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তনের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যে বহু কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যে অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের মহিমাব্যঞ্জক অসংখ্য পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগায়কগণ সেগুলিতে তাল মান সংযোগ করিয়া খোল করতালের সাহায্যে সেগুলি গান করিতেন। বৈষ্ণবগণের দ্বারা সঙ্গীতবিদ্যার বহু উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী বহু লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সঙ্গীতাচার্য্যগণ নূতন নূতন সুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের প্রবাহে দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামে গ্রামে মধুর সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি শ্রুত হইত। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া

অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেন। সময়ে সময়ে ক্রমান্বয়ে সমস্ত দিন, তিনদিন, সাতদিন ধরিয়া সঙ্কীর্ত্তন চলিত।

এই সকল উপায়ে দেশের ধর্ম্মভাব গভীর হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে অনেক গভীর ধর্ম্মভাবসম্পন্ন ভক্তের অভ্যুদয় হইয়াছিল। গভীর বিশ্বাস, প্রগাঢ় ভক্তি, সাত্ত্বিক আচার ব্যবহারের জন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায় জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা প্রভাবে দেশ হইতে তান্ত্রিক পূজা ও আচার বহু পরিমাণে অপসারিত হইয়াছিল। পশুবলি, মাংস ভক্ষণ অনেক পরিমাণে রহিত হইয়াছিল। জাতিভেদের তীব্রতা খর্ব্ব হইয়াছিল। যে সকল জাতি হিন্দু সমাজে ঘৃণিত ছিল তাহারা সমাজ মধ্যে সম্মান লাভ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, যাঁহারা জাতিভেদ সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতি-ভেদের কোন চিহ্ন রাখিতেন না। যে কোন জাতির লোক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারিতেন এবং তৎপরে তাঁহাদের মধ্যেই অবাধে আহার এবং বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান চলিত। ইঁহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল এবং নারীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। প্রথমে এই সম্প্রদায়ের লোক বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কেহ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিলে মনে করা হইত তিনি স্বীয় জাতি ও কুল পবিত্র করিয়াছেন। কিন্তু উত্তরকালে এই সম্প্রদায় অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার পাত্র হইয়াছিল। নৈতিক শিথিলতা তাহার কারণ। চরিত্র দোষে কোন পুরুষ বা রমণী জাতিচ্যুত হইলে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইত। কালক্রমে বৈষ্ণবমণ্ডলীর ধর্ম্মভাব ম্লান হইলে শ্রীচৈতন্যের শিষ্যগণের অবস্থা হীন হইয়াছিল। ভারতীয় সংস্কার

চেষ্টার ইহা সাধারণ লক্ষণ। এই দেশে কোন ধর্ম্মান্দোলনই দীর্ঘকাল অক্ষুন্ন থাকিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম ত দেশ হইতে একেবারেই বিতাড়িত হইয়াছে। রামানন্দ, কবীর প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মধারা একেবারে উন্মূলিত না হইলেও, নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছে। গুরু নানক প্রতিষ্ঠিত শিখধর্ম্ম কিছুদিন প্রবল উৎসাহে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সে স্রোত বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার অনেক দুর্গতি হয়। শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরও এই প্রকার দুর্গতি হয়।

উত্তরকালে অবসাদগ্রস্ত হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্ম বঙ্গদেশ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া তৎকালীন সমাজকে সরস রাখিয়াছিল। চৈতন্যদেব ধর্ম্মজীবনের যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার অনুকরণে বহুসংখ্যক সাধক জীবন গঠন করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য গভীর ব্যাকুলতা, সরস, সুমধুর উচ্ছ্বসিত ভক্তি, প্রগাঢ় একনিষ্ঠ সাধন, অকপট বিনয়, অসাধারণ ত্যাগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজকে উন্নত করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় হইতে ঠাকুর নরোত্তম দাসের তিরোভাব পর্য্যন্ত নাতিদীর্ঘ কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যে সমুদয় সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন জগতের যে কোন ধর্ম্মসমাজে তাঁহাদের জীবন অলঙ্কার-স্বরূপ হইতে পারিত। বঙ্গদেশ তাঁহাদের জন্মে ধন্য, এবং বাঙ্গালী জাতি তাঁহাদের জীবনে চির গৌরবান্বিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী ভালরূপে রক্ষিত হয় নাই, এবং বর্ত্তমান সভ্যজগত তাহার কোন সংবাদ জানেন না। রঘুনাথ দাস, রূপসনাতন, ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধুগণের সম্পূর্ণ জীবন-চরিত যদি লিখিত হইত তাহা হইলে সেণ্ট্ ফ্রান্সিস, সেণ্ট্ জেভিয়ার,

সেণ্ট্‌ লয়োলা প্রভৃতি খৃষ্ট সাধুগণের ন্যায় তাঁহারা সভ্য জগতে সম্মানিত হইতেন। ধর্ম্মের জন্য এমন ব্যাকুলতা জগতে কমই দেখা গিয়াছে। বিষয়-বৈরাগ্য, অসাধারণ ত্যাগ, কঠোর আত্ম-শাসন, অপূর্ব্ব সাধননিষ্ঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসকে কিছুকালের জন্য সমুন্নত এবং গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবই এই উচ্ছ্বসিত ধর্ম্মভাবের উৎস। বঙ্গদেশের ধর্ম্ম-জীবনে তিনি যে নূতন আবেগ আনিলেন তাহা শতধারে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তীগণও স্ব স্ব জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব ও সাধনার দ্বারা এই আবেগকে বহু পরিমাণে পুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ ত্যাগ এবং কঠোর সাধনা শ্রীচৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তীগণের উপযুক্তই ছিল। তাঁহারা চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত সাধনপ্রণালীর অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান সাধন সঙ্কীর্ত্তন। এই সঙ্কীর্ত্তন প্রণালী কতটুকু শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত এবং কতটুকু অনুবর্ত্তীগণের কার্য্য তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি চৈতন্যদেব খোলকরতাল সহকারে সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই সঙ্কীর্ত্তনের যে বহু উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ অসংখ্য পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব গায়কগণ বহু নূতন নূতন সুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কোনও সঙ্গীতাভিজ্ঞ লেখক বৈষ্ণব সঙ্গীতের ইতিহাস লিখিলে ভাল হয়। বৈষ্ণব পদাবলী এবং বৈষ্ণব সঙ্গীত বঙ্গদেশের একটি বিশেষ সম্পদ। সভ্য জগতে ইহার সমধিক সমাদর এখনও হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে অনেক উচ্চ শ্রেণীর গায়কের অভ্যুদয় হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের সঙ্গীগণের

মধ্যে মুকুন্দ সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। নিত্যানন্দের পারিষদগণের মধ্যে মাধব, বাসু এবং গোবিন্দ এই তিন ভ্রাতা সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। উত্তরকালে নরোত্তম দাস ও তাঁহার সহযোগীগণ বৈষ্ণব সঙ্গীতের বহু উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্মসাধনের পক্ষে সাধুসঙ্গ ও সাধু সেবার মহত্ত্ব বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এমন কি, তাঁহারা ভগবৎসেবার উপরে ভক্তসেবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর কোন ধৰ্ম্মসম্প্রদায়ে সাধুসঙ্গের এত উচ্চস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব সাধকগণের সাধুভক্তি ও সাধুসেবা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কথিত আছে, জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্য দশায় কঠোর পরিশ্রমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার অমর গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়া বৃন্দাবনের বৈষ্ণব নেতা শ্রীজীবগোস্বামীর অনুমোদনের জন্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামী ঈর্ষাবশতঃ গ্রন্থখানি নষ্ট করিয়া দেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অম্লানবদনে এই মর্ম্মান্তিক নির্য্যাতন সহ্য করেন। রচনা সময়ে একজন শিষ্য কবিরাজ গোস্বামীর অজ্ঞাতসারে গ্রন্থখানির একটি প্রতিলিপি লইয়াছিলেন বলিয়াই 'চৈতন্য চরিতামৃত' রক্ষিত হইয়াছে। এই কথা সত্য না হইলেও ইহাতে বৈষ্ণবভক্তের অসাধারণ সাধুভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কাহাকেও দীক্ষিত করেন নাই। তাঁহার সময়ে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে বিশেষ দীক্ষাপ্রণালী প্রবৰ্ত্তিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু উত্তরকালে তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে দীক্ষার প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রত্যেক বৈষ্ণবই কোন না কোন গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। সাধারণ বৈষ্ণব-ভক্তি ব্যতীত এই গুরুভক্তির বিশেষ প্রচলন ছিল। প্রথম প্রথম

যোগ্যতা অনুসারে গুরু নির্ব্বাচিত হইতেন। এমন কি ব্রাহ্মণও শূদ্রকে গুরুরূপে বরণ করিতেন। কিন্তু উত্তরকালে বংশানুক্রমে গুরু হইতেন এবং এ প্রথার বহু অপব্যবহারও হইয়াছে।

সঙ্কীর্ত্তন ও সাধু-সঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠও বৈষ্ণবমণ্ডলীতে বিশেষ সমাদৃত ছিল। এক একটি আশ্রম বা কেন্দ্রে যেমন নিত্য সঙ্কীর্ত্তন হইত, তেমনি প্রতিদিন গভীর শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যজীবনী প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হইত। বৈষ্ণবগণ সেই পাঠ শ্রবণ করিয়া ভক্তিতে আপ্লুত হইতেন।

বৈষ্ণবমণ্ডলীতে কি প্রকার নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থপাঠ হইত তাহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি।

সকল মহান্ত শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
শুনিতে তোমার মুখে বড় সাধ হয়॥
শ্রীমদ্ভাগবত পড় বসি এ আসনে।
না কর সঙ্কোচ আমা সবার বচনে॥
শুনি শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি প্রণমিয়া।
করয়ে যে দৈন্য ধৈর্য্য ধরে কে শুনিয়া॥
পুনঃ পুনঃ অনুমতি পাইয়া সবার।
বসিলা আসনে শোভা হৈল চমৎকার॥
পুস্তকে অর্পিয়া পুষ্প তুলসীচন্দন।
করয়ে আরম্ভ চারু মঙ্গলাচরণ॥
কোকিল জিনিয়া অতি সুমধুর স্বরে।
উচ্চারয়ে শ্লোক যেন সুধাবৃষ্টি করে॥
শ্রীরাস বিলাস কথা রসের পাথার।
কহিতে অধৈর্য্য নেত্রে বহে অশ্রুধার॥

বিবিধ প্রকারে প্রতি পদ্য ব্যাখ্যা করে।
নানা রাগ প্রভেদ প্রকাশে পদ্য দ্বারে ॥
কি অদ্ভুত কথার মাধুর্য্য ধৈর্য্য নাশে।
উপমার স্থান নাই সে মধুর ভাষে ॥
মহাবর্ষাপ্রায় প্রেমবর্ষে সে কথায়।
সকলে বিহ্বল হর্ষ উথলে হিয়ায় ॥
অনিমিষ নেত্রে চাহে শ্রীনিবাস পানে।
নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥
মহান্তগণের হয় যে ভাব বিকার।
তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুই ছার ॥
আত্মবিস্মরিত কেহ মনে মনে কয়।
শ্রীশুক অর্পিল শক্তি তেঞি ঐছে হয় ॥
কেহ কহে শক্তি সঞ্চারিল বেদব্যাস।
তেঞি এ অদ্ভুত অর্থ করয়ে প্রকাশ ॥
কেহ কহে গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
বুঝি যথাশক্তি পূর্ণ প্রকাশে এথাই ॥
কেহ কহে পণ্ডিত শ্রীবাসাদি কৃপায়।
ঐছে পাঠলালিত্য কি তুলনা ইহায় ॥
কেহ কহে গৌরপ্রেম স্বরূপ এ হন।
এ মুখে সে বক্তা তেঞি ঐছে আকর্ষণ ॥
ঐছে স্নেহাবেশে মনে যে হয় সবার।
তাহা কেহ বর্ণিবেন করিয়া বিস্তার ॥
প্রভু পরিকরের কি অদ্ভুত চরিত।
করয়ে শ্রবণ যৈছে উপমা রহিত ॥

শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃত আস্বাদনে।
কৈছে দিন যায় তাহা কিছুই না জানে॥
শ্রীনিবাস দেখে দিবা অবসান হৈল।
প্রার্থনা পূর্ব্বক কথামৃত সাঙ্গ কৈল॥
গ্রন্থে প্রণমিয়া অতি দীনতা অন্তরে।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা প্রভু পরিকরে॥

বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ধর্ম্মগ্রন্থের এত সমাদর হইয়াছিল যে উত্তরকালে শিখদিগের গ্রন্থসাহেবের ন্যায় অনেক অবস্থাপন্ন বৈষ্ণব পরিবারে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের নিত্য পূজা হইত। পুরোহিত আসিয়া প্রতিদিন তুলসী পত্র ও গঙ্গাজল দিয়া এই সকল গ্রন্থ পূজা করিতেন।

তীর্থ ভ্রমণ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আর একটি সাধন বলিয়া গণ্য ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য নীলাচলে গমন করিতেন। তাঁহার পরলোক গমনের পরেও বৈষ্ণবগণ ভক্তির সহিত তথায় জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন। বৈষ্ণবদিগের অপর একটী বিশেষ স্পৃহনীয় তীর্থ স্থান ছিল মথুরা বৃন্দাবন। অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, চৈতন্যদেব সকলেই সেখানে গমন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার ক্ষেত্র বলিয়া বৃন্দাবন হিন্দুদিগের প্রিয় তীর্থ ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের পরে ইহা বৈষ্ণবগণের বিশেষ সমাদরের স্থান হইয়াছে। তাঁহারা বলেন শ্রীচৈতন্যদেব প্রাচীনকালের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন। একথা আংশিকভাবে সত্য। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অনুবর্ত্তী রূপ ও সনাতনকে বৃন্দাবনে যাইয়া অবস্থান করিতে আদেশ দেন। তখন হইতে বহু বৈষ্ণবভক্ত তথায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন

এবং দলে দলে বৈষ্ণবগণ তীর্থ দর্শনের জন্য মথুরা বৃন্দাবন গমন করিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া নবদ্বীপও বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। নানাস্থান হইতে বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান দেখিবার জন্য নবদ্বীপ আসিতেন। অদ্বৈতাচার্য্যের বাসস্থান বলিয়া ভক্তগণ শ্রদ্ধার সহিত শান্তিপুরে গমন করিতেন। এতদ্ভিন্ন যে যে স্থানের সহিত বৈষ্ণব নেতাগণের সংস্পর্শ ছিল তৎসমুদয়ই বৈষ্ণব-তীর্থে পরিণত হইয়াছে। কাটোয়ায় যে স্থানে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বৈষ্ণবগণ বিশেষ ভক্তির সহিত সে স্থানটি দেখিতেন। ঠাকুর নরোত্তমদাসের জন্মস্থান রাজসাহী জেলার খেতরী গ্রাম এখনও বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে। এই সকল স্থান দেখিবার জন্য বৈষ্ণবগণ গভীর ব্যাকুলতা ও শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। বিশেষ বিশেষ দিনে স্থানে স্থানে শত শত লোক একত্রে যাইতেন। এই প্রকার দেশ ভ্রমণে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হওয়া ব্যতীত সাধারণ শিক্ষারও সুযোগ হইত।

এই সকল ছিল বৈষ্ণবদিগের সাধারণ সাধন। তাঁহাদের লক্ষ্য বা সাধ্যবস্তু ছিল প্রেমভক্তি লাভ। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে যে ভক্তির বর্ণনা আছে, শ্রীচৈতন্যদেব নিজ জীবনে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগণ স্ব স্ব জীবনে তাহা লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পরে অনেক বৈষ্ণব উচ্চশ্রেণীর সাধক হইয়াছিলেন। তাঁহারা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তির সাধনা করিতেন। বিশেষভাবে দাস্য ও মধুর ভক্তি তাঁহাদের লোভনীয় ছিল। বৈষ্ণব সাধকগণ বৃন্দাবনের গোপীভাব লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন। রাধাকৃষ্ণের আখ্যায়িকায় গোপীগণের যে স্থান বৈষ্ণব-

সাধকগণ চৈতন্যলীলায় সেই স্থান আকাজ্ক্ষা করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীরাধিকার সখীকল্পনা করিতেন। দীক্ষাসময়ে তাঁহারা সখীভাবে নামও গ্রহণ করিতেন। এইরূপে সাধকদিগকে মনীমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। বৈষ্ণব সাধকগণ আধ্যাত্মিক জীবনের একটি উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেটি স্ত্রীভাব। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন ধর্ম্মাচার্য্য অধ্যাপক নিউম্যান বলিয়াছেন স্ত্রীভাব লাভ ধর্ম্মজীবনের অতি শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁহার বহুপূর্ব্বে বৈষ্ণব সাধকগণ এই আদর্শ ধরিয়াছিলেন এবং জীবনে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৈষ্ণব সাধকই স্ত্রীভাব সাধন করিতেন। এই বিষয়ে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে বিখ্যাত ভক্ত মীরাবাই বৃন্দাবন অবস্থানকালে একবার সনাতন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া সনাতন গোস্বামী বলিয়া পাঠান যে তিনি প্রকৃতি সম্ভাষণ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। ইহা শুনিয়া মীরাবাই বলেন বৃন্দাবনে দ্বিতীয় পুরুষ আছেন ইহা নূতন কথা। আমিত জানিতাম ব্রজেন্দ্রনন্দন এখানে একমাত্র পুরুষ। আর সকলেই প্রকৃতি।

স্ত্রীভাবসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের সমুদয় কোমল প্রকৃতি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয়ান বলিতে যেমন কতকগুলি গুণ বোঝায়, বৈষ্ণবনামের সঙ্গে সঙ্গেও তেমনি কতকগুলি গুণ মনে পড়ে। বৈষ্ণবচরিত্র বলিতে মনের সম্মুখে একটি জীবন্ত ছবি জাগিয়া উঠে। এই ছবিতে দয়া, ভক্তি, ব্যাকুলতা, প্রেম, বিনয়, প্রভৃতি গুণরাশি দেদীপ্যমান। এখনও বৈষ্ণব চরিত্রে বিনয়ের ভাব বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাধকগণের বিনয় দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহাদের কথায় মধু বর্ষিত হয়। গতি মৃদু এবং

মন্দ। সকলকে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করেন। বৈষ্ণব সাধকগণ বৈষ্ণব নামকে নিজ চরিত্র দ্বারা গৌরবান্বিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের সময় হইতেই ঠাকুর নরোত্তম পর্য্যন্ত বহু ভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহাদের অনেকের অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করা হইল।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মবিধানে শ্রীচৈতন্যদেবের নীচেই নিত্যানন্দের স্থান। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বলরামের অবতার মনে করেন। বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে তাঁহার নাম ও প্রতিপত্তি প্রায় শ্রীচৈতন্যের সমতুল্য। নিত্যা-নন্দের খ্যাতি এত অধিক কেন ঠিক বুঝা যায় না। প্রতিভার মৌলিকতায় এবং চরিত্রের গাম্ভীর্য্যে তিনি চৈতন্যদেবের অপেক্ষা হীন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে তাঁহার প্রতিপত্তির একটি কারণ এই বোধ হয় তিনি বঙ্গদেশে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তাঁহারাই বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লেখক বৃন্দাবন দাস তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য ভাগবতের শেষ অংশে তিনি নিত্যানন্দের কার্য্যবিবরণ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তাঁহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে ভক্তিধর্ম্ম বিষয়ে গভীর পরামর্শ করিতেন। তিনি যখন নীলাচলে বাস করিতেছিলেন সেই সময়ে গোপনে দুইজনে পরামর্শ করিতেন। সম্ভবতঃ ভক্তিধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে আলোচনা হইত। বৈষ্ণবগণ নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যের ভ্রাতার তুল্য মনে করিতেন। সর্ব্বদাই গৌর-নিতাই দুটি নাম একসঙ্গে উল্লিখিত হয়। শচীদেবী নিত্যানন্দকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে রক্তের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

রাঢ়ে একচক্রা বা একচাকা নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে নিত্যানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হাড়াই ওঝা এবং মাতা পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ তাঁহাদের অতি আদরের ছিলেন। তাঁহার আদি নাম কি

জানা যায় না। প্রথম হইতেই তিনি নিত্যানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু মনে হয় এই নাম সন্ন্যাসগ্রহণের সময় প্রদত্ত হইয়াছিল। বাল্যকালেই তাঁহার চিন্তাশীলতা এবং ধর্ম্মে অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অল্পবয়সেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ভাগবতাদি শাস্ত্রের সহিতও তাঁহার পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। সঙ্গী বালকদের সহিত তিনি কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতির জীবনচরিত অভিনয় করিতেন।

নিত্যানন্দের বয়স যখন বার বৎসর, তখন একজন তীর্থপর্য্যটক সন্ন্যাসী তাঁহার পিতার গৃহে অতিথি হন। হাড়াই ওঝা পরম সমাদরে অতিথি সৎকার করেন। নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী গমনকালে এক নিদারুণ প্রস্তাব করেন। তিনি দক্ষিণাস্বরূপ বালক নিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাহিলেন। হাড়াই ওঝা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; প্রাণের নিত্যানন্দকে তদনুসারে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু পদ্মাবতী ও তিনি প্রিয় পুত্রের বিরহে দারুণ মর্ম্মবেদনা পাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ সেই যে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, আর ফিরিলেন না। পিতামাতা আশা করিয়াছিলেন কিছুদিন পরে পুত্র আবার তাঁহাদের দেখিতে আসিবেন। কিন্তু পিতামাতার জীবদ্দশায় তাঁহাদের সহিত নিত্যানন্দের আর সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি নানা স্থানে তীর্থপর্য্যটনে যান। জীবনচরিত লেখকগণ লিখিয়াছেন, তিনি বিশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করেন। প্রথমে বোধ হয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাইতেন। কিন্তু, স্থানে স্থানে একাকী যাওয়ারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে—

"তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর॥"

আদি খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা বক্রেশ্বর যান। তথা হইতে বৈদ্যনাথ, তৎপরে গয়া হইয়া কাশী যান। এই অল্প বয়সে বালক নিত্যানন্দের গভীর ধর্ম্মানুরাগ লক্ষিত হয়। কাশীতে গঙ্গা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে।

"গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ রায়।
স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায়॥"

চৈঃ ভাঃ, আঃ খঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

কাশী হইতে মাঘ মাসে প্রয়াগে গিয়া মকর স্নান করেন। তৎপরে মথুরা, বৃন্দাবন দর্শন করেন। জীবনচরিত লেখকগণ যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা যদি ঐতিহাসিক হয় তাহা হইলে এই বয়সেই নিত্যানন্দের গভীর কৃষ্ণভক্তি জন্মিয়াছিল।

"যমুনা-বিশ্রাম ঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বুলেন কুতুহলী॥
শ্রীবৃন্দাবন-আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ॥
গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া॥
তবে প্রভু মদনগোপালে নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর—পাণ্ডবের পুরী॥
ভক্ত স্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তি শূন্যের কারণ॥

চৈঃ ভাঃ, আঃ খঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর তিনি দ্বারকা গমন করেন। সেখান হইতে সিদ্ধপুর ও মৎস্য দেশ গমনের উল্লেখ আছে।

ইহার পরে নিত্যানন্দ দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীপুর (বর্ত্তমান কাঞ্চীভরণ) গিয়াছিলেন লিখিত আছে। কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। দ্বারকা হইতে কাঞ্চী দীর্ঘ পথ; পথে অনেক তীর্থ আছে। সেগুলি না দেখিয়া তাঁহারা দাক্ষিণাত্য যাইবেন তাহা মনে হয় না। বিশেষতঃ তাহার পরেই উত্তর ভারতবর্ষের নানা তীর্থ ভ্রমণের বর্ণনা রহিয়াছে। কাঞ্চীর পরে কুরুক্ষেত্র গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রভাস, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি বহুস্থান ভ্রমণের উল্লেখ আছে। অযোধ্যায় শ্রীরামের জন্মস্থান দেখিয়া বহু ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে গুহক চণ্ডালের রাজ্যে গমন করিলেন। গুহক চণ্ডালের কথা স্মরণ করিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লিখিত আছে তিনি তিন দিন মূর্চ্ছিত অবস্থায় ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিও এই সময়ে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকল স্থানের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের নাম সংসৃষ্ট আছে একে একে তৎসমুদয় দর্শন করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হন।

"যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ॥"

চৈঃ ভাঃ, আঃ খঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

রামায়ণোল্লিখিত গোমতী, গণ্ডকী, শোন প্রভৃতি দর্শন করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। এই মহেন্দ্র পর্ব্বত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে। কিন্তু ইহার পরেই গঙ্গা জন্মভূমি হরিদ্বার গমনের বিবরণ আছে। কিন্তু ইহাও প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। ইহার কিছু পরে তিনি দ্রাবিড় গিয়াছিলেন। সেই সময়ে কাঞ্চী, মহেন্দ্র পর্ব্বত প্রভৃতি স্থান গমন অধিকতর সম্ভব।

কোন্ সময়ে কাহার নিকটে নিত্যানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহার

বিবরণও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ লিখিত আছে তিনি যখন শ্রীপর্ব্বতে গিয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার অবধূত বেশ।

"কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেল যথা মহেশ-পার্ব্বতী॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরূপে মহেশ-পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি॥
নিজ-ইষ্টদেব চিনিলেন দুইজনে।
অবধূতরূপে করে তীর্থ-পর্য্যটনে॥"

চৈতন্য ভাগবত আঃ খঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীপর্ব্বতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী অতিথি-সৎকারকেই ভিক্ষা প্রদান বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহাতেও মনে হয় নিত্যানন্দ ইতিপূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি দ্রাবিড় গমন করেন এবং বেঙ্কটনাথ, কামকোষ্ঠীপুরী, কাঞ্চী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গনাথ, দক্ষিণ মথুরা (বর্ত্তমান মাদুরা) প্রভৃতি বহু তীর্থ দর্শন করেন। ইহার পরে বদরিকাশ্রমে গমনের উল্লেখ আছে। বদরিকাশ্রমে কিছুদিন তিনি নির্জ্জনে বাস করেন। সেস্থান হইতে ব্যাসের আলয়গমনের উল্লেখ আছে। তৎপরে বৌদ্ধদের বিহারে যাওয়ার বিবরণ আছে। সেটা কোন্ স্থানে তাহা জানা যায় না। বৌদ্ধগণ ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর না দেওয়ায় ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে লাথি মারেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ ক্রুদ্ধ হন নাই। ইহাতে তাঁহাদেরই মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

অতঃপর নিত্যানন্দের পুনরায় দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের পরিচয় পাওয়া

২

যায়। চৈতন্যভাগবতে দক্ষিণসাগর ও কেরল গমনের উল্লেখ আছে। এই সময়ে মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কোথায় এই মিলন হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয় দাক্ষিণাত্যেরই কোন অরণ্য প্রদেশে হইয়া থাকিবে। উভয়ের মিলনে বহু আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। মাধবেন্দ্রপুরী মহা প্রেমিক, রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকিতেন। মেঘ দেখিলে তিনি ভাবে অধীর হইয়া পড়িতেন। হরিনাম শ্রবণে তাঁহার স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু দেখা দিত। চৈতন্যদেব তাঁহাকে ভক্তিরসের আদি সূত্রধার বলিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ বিশ্বাস করিতেন তাঁহার স্পর্শে ভক্তিলাভ হয়। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বর-পুরীর নিকট শ্রীচৈতন্য গয়ায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন হইতেই তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দকে পাইয়া পরম সুখী হন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতির যোগ সংস্থাপিত হয়। নিত্যানন্দ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন। মাধবেন্দ্রও তাঁহাকে বহু সমাদর করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ বলিয়া-ছিলেন তিনি যত তীর্থ করিয়াছেন মাধবেন্দ্রপুরী দর্শনে তাহা সার্থক হইয়াছিল। মাধবেন্দ্রপুরীও বলিয়াছিলেন নিত্যানন্দকে দেখিয়া সকল তীর্থের ফললাভ হইয়াছে।

"মাধবেন্দ্র বোলে 'প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইলুঁ সংহতি॥
যে সে-স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ-বৈকুণ্ঠাদি ময়॥' "

চৈঃ ভাঃ, আঃ খঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

এই সময়ে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। ইঁহারাও নিত্যানন্দের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই নিত্যানন্দের হৃদয়ে প্রেম ভক্তির আবির্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

"নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস॥"

চৈঃ ভাঃ, আঃ খঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত মিলনে এই ভক্তিভাব আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। কয়েকমাস মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত অবস্থান করিয়া নিত্যানন্দ পুনরায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। এবার তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে গিয়াছিলেন।

অতঃপর পূর্ব্ব উপকূল ধরিয়া তিনি উত্তরাভিমুখে গমন করেন। এই যাত্রায় বিজয়নগর, গোদাবরী, জিওড়, ত্রিমল্ল, কূর্ম্মনাথ হইয়া তিনি নীলাচল আগমন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-কালে এই পথ দিয়া পুরী প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দের ভ্রমণকাল যেমন দীর্ঘতর তেমনি তিনি অনেক অধিক তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। নীলাচলে জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজা দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। জগন্নাথ হইতে গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে যান, এবং তৎপর পুনর্ব্বার মথুরায় গিয়া সেখানে স্থায়ী হইয়া বাস করেন। এই সময়ে তিনি বহু কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছিলেন। কিছু আহার করিতেন না; কেহ যদি অযাচিত ভাবে দুগ্ধ দিতেন তাহাই মধ্যে মধ্যে পান করিতেন। বৃন্দাবনে নিত্যানন্দ কতদিন বাস করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাঁহার সমগ্র তীর্থপর্য্যটন কাল বিংশতি বৎসর বলিয়া উল্লেখ আছে। এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে

অবস্থিতিও গণনা করা হইয়াছে। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট হইলে নিত্যানন্দ বৃন্দাবন ছাড়িয়া নবদ্বীপে আসেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ বলেন, নিত্যানন্দ অন্তরে শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ জানিয়া বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসেন। কিন্তু ইহাও হইতে পারে তিনি অভ্যস্ত তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ আসেন, অথবা লোকমুখে শ্রীচৈতন্যের প্রকটের সংবাদ পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে লোকনাথ বৃন্দাবন আগমন করেন। তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের সংবাদ পাওয়া সম্ভব। নবদ্বীপে পৌছিয়া প্রথমে তিনি শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। নন্দন আচার্য্য নামক একজন প্রবীণ বৈষ্ণবের গৃহে অতিথি হন। বৈষ্ণব-জীবনচরিত লেখকগণ লিখিয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আগমন অনুভব করিয়াছিলেন। দু'একদিন পূর্ব্ব হইতেই সঙ্গীগণকে বলিতেন অবিলম্বে কোন মহাপুরুষের আগমন হইবে। পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি এক স্বপ্ন দেখেন যেন তালপ্রমাণ একখানি রথ আসিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে লাগিল। তাহা হইতে একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ অবতরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের বাড়ী কোথায়? শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আগন্তুক পুরুষ বলিলেন— ভাই হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছ? এই সকল কারণে শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্ব হইতেই নিত্যানন্দের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি শ্রীবাস আচার্য্য এবং হরিদাস ঠাকুরকে এই আগন্তুকের অন্বেষণে নগরে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সমুদয় নগর অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া [illegible]লেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সঙ্গীদের লইয়া অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নন্দনাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক দীর্ঘাকৃতি, বিশালদেহ, প্রশস্ত ললাট,

আজানুলম্বিত বাহু, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুরুষ বসিয়া আছেন। তখন নিত্যানন্দের পূর্ণ যৌবন। বয়স প্রায় ৩২ বৎসর। শ্রীচৈতন্যদেবেরও বয়স ২২ বৎসরের অধিক হইবে না। সুতরাং নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা দশ বৎসরের বড়। নিত্যানন্দকে দেখিয়া বিশ্বম্ভর সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। নিত্যানন্দ প্রতি-নমস্কার করিলেন। চৈতন্যদেব তখন শ্রীবাস পণ্ডিতকে ভাগবত হইতে কৃষ্ণের স্তুতিবিষয়ক একটি শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। শ্লোক শুনিয়াই নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্য "পড় পড়" বলিয়া শ্রীবাসকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে নিত্যানন্দ সংজ্ঞা পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, আবার ভূমিতে পড়িয়া কখনও বা গড়াগড়ি দেন। বৈষ্ণবগণ এই অদ্ভুত কৃষ্ণোন্মাদ দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে ধরিয়া কোলে করিলেন। তখন তিনি শান্ত হইলেন। পরস্পরের পরিচয় হইল; উভয়ে উভয়ের বহু স্তুতি করিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেব নিত্যানন্দকে বলিলেন, "আপনি স্বয়ং ঈশ্বর; আপনার চরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক হইল।" নিত্যানন্দ বলিলেন "তুমি স্বয়ং কৃষ্ণ; অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু সর্ব্বত্র দেখি সিংহাসন শূন্য। লোকে বলে কৃষ্ণ নবদ্বীপ গিয়াছেন।" এ প্রকার স্তুতিবাদ ও অত্যুক্তি বৈষ্ণব-গ্রন্থে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহা গ্রন্থকারদেরই কল্পনা।

পরদিন ব্যাস-পূজা। বহুক্ষণ আলাপের পর শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় আপনার ব্যাস-পূজা হইবে? নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে দেখাইয়া বলিলেন এই ব্রাহ্মণের গৃহে। তখন নিত্যানন্দকে লইয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীবাসের গৃহে আসিলেন। সেখানে আসিয়াই প্রমত্ত কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রেমে

উন্মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিলেন এবং বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহাই নিত্যানন্দের প্রথম নবদ্বীপের বৈষ্ণব-দলের কীর্ত্তন-সম্ভোগ। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হইল, অবশেষে বৈষ্ণবগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহেই রহিলেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণ লিখিয়াছেন সেই রাত্রিতেই নিত্যানন্দ স্বীয় সন্ন্যাসের চিহ্ন দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলেন। নবদ্বীপ আগমনের প্রথম দিনেই এই ঘটনা হইয়াছিল কি না বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে নবদ্বীপ আগমনের পরেই নিত্যানন্দ দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি বোঝা যায় না।

নিত্যানন্দের চরিত্র কিছু রহস্যময়। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। নতুবা দীর্ঘকালের সন্ন্যাসব্রত সাময়িক উত্তেজনায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। উত্তরকালে তিনি সন্ন্যাসের উপর শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ হারাইয়াছিলেন এবং গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয় তখনও তিনি সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। শ্রীচৈতন্যের আদেশে যখন তিনি হরিদাসের সঙ্গে নবদ্বীপের গৃহে গৃহে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন তখন উভয়েরই সন্ন্যাসীর বেশ বলিয়া উল্লিখিত আছে।

এখন হইতে শ্রীবাসের গৃহই নিত্যানন্দের স্থায়ী বাসস্থান হইয়াছিল। শ্রীবাস ও তাঁহার পত্নী পরম সমাদরে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। নিত্যানন্দও তাঁহাদিগকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। তিনি শ্রীবাসকে পিতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবীকে মা বলিয়া ডাকিতেন। মালিনী দেবী স্বহস্তে শিশুর মত নিত্যানন্দকে আহার করাইতেন। সময়ে সময়ে নিত্যানন্দ মালিনী দেবীর

স্তন্য পান করিতেন বলিয়া লিখিত আছে। নিত্যানন্দ অনেক সময়ে বাল্য ব্যবহার করিতেন। আহারের সময়ে চারিদিকে অন্ন ছড়াইতেন; ইহা বোধ হয় তিনি ইচ্ছা করিয়াই করিতেন। সম্ভবতঃ জাতিভেদ ও লোকাচারের মস্তকে লগুড়াঘাতের উদ্দেশ্যে এরূপ করিতেন। সকলের সঙ্গে আহার করিতে বসিয়া উচ্ছিষ্ট ছড়াইয়া তাঁহাদের জাতিগত সংস্কার ভগ্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন। নবদ্বীপের পথে পথে অনেক সময়ে বালকের ন্যায় চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেন। গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে গিয়া বৈষ্ণবগণের চোখে জল ছড়াইয়া দিতেন। কুম্ভীর দেখিলে সন্তরণ দিয়া ধরিতে যাইতেন। এমন কি এক এক সময়ে ভদ্রগৃহে উলঙ্গ হইয়া মাথায় কাপড় বাঁধিয়া নৃত্য করিতেন। একমাত্র চৈতন্যদেবের বাক্যে শান্ত হইতেন। চৈতন্যদেবকে তিনি বিশেষ ভক্তি করিতেন। চৈতন্যদেবও নিত্যানন্দকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা একত্রেই থাকিতেন। সঙ্কীর্ত্তন সময়ে উভয়ে একত্রে নৃত্য করিতেন। চৈতন্যদেব পড়িয়া গেলে নিত্যানন্দ তাঁহাকে কোলে করিয়া ধরিতেন। শচীদেবীও নিত্যানন্দকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বরূপের কথা স্মরণ হইত। মনে করিতেন সন্ন্যাস হইতে বিশ্বরূপ ফিরিয়া আসিয়াছেন।

নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ সকলেই নিত্যানন্দকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই সকলের সঙ্গেই তাঁহার আন্তরিক যোগ হইয়াছিল। এইরূপে আনন্দে শ্রীবাসের গৃহে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেব যখন ভক্তিধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন তখন নিত্যানন্দকে একজন প্রচারক মনোনীত করিলেন। শ্রীচৈতন্যের আদেশে নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপের ঘরে ঘরে

হরিনাম বিলাইতে লাগিলেন। প্রথম খণ্ডে তাহা বিবৃত হইয়াছে। জগাই মাধাই উদ্ধারের বিস্তৃত বিবরণও সেখানে দেওয়া হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারে নিত্যানন্দের মহত্ত্বই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই ব্রাহ্মণ তনয়ের দুর্গতি দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারের সঙ্কল্প নিত্যানন্দের হৃদয়ে প্রথমে জাগ্রত হয়। মাধাই নিত্যানন্দকে কলসীর কাণা প্রহার করে এবং নিত্যানন্দ অপরাধীর প্রতি আশ্চর্য্য ক্ষমা প্রদর্শন করেন। নিত্যানন্দ মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি জন্ম জন্মান্তরেও যদি কোন পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি তাহা তোমাকে দিলাম।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কথা জগতের ধর্ম্মসাহিত্যে ঈশার "Father forgive them for they know not what they do," পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা কর—কারণ ইহারা কি করিতেছে জানে না—এই মহাবাক্যের ন্যায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। অধম, পতিত, অপরাধীদের প্রতি নিত্যানন্দের প্রথম হইতেই গভীর করুণার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইরূপে শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশ অনুসারে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরে দারুণ অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি গৃহ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতির আর একটি পরিচয় এইখানে পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প সর্ব্বাগ্রে নিত্যানন্দকে জানান। নিত্যানন্দ দুঃখিত হইলেও কোন প্রতিবাদ করেন নাই। আমাদের মনে হয় ইতিপূর্ব্বেই নিত্যানন্দের সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা চলিয়া গিয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসের চিহ্ন নিজের দণ্ড কমণ্ডলু ভাজিয়া ফেলিয়া-

ছিলেন। উত্তরকালে নীলাচলের পথে শ্রীচৈতন্যদেবের দণ্ডও ভঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের সময়ে বিশেষ কোন আপত্তি করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা গদাধর পণ্ডিত চৈতন্য-দেবের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।• চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিত্যানন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ও সন্ন্যাসের পর তিনি চৈতন্যদেবকে ফিরাইয়া শান্তিপুরে লইয়া যান। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাইবেন •বলিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া শান্তিপুরে লইয়া আসেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি চৈতন্য ভাগবতের মতে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই পশ্চিম গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভি-মুখে নীলাচল গমন করেন। পথে কয়েকদিন শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে যাপন করেন। পথ হইতে নিত্যানন্দকে নবদ্বীপের ভক্তগণ ও শচীমাতাকে আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। কয়েকদিন শচীমাতা ও ভক্তগণের সঙ্গে অদ্বৈতভবনে যাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল গমন করেন। সঙ্গে মাত্র অল্প কয়েকজন ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিত্যানন্দই প্রধান।

দাক্ষিণাত্য গমনকালে নিত্যানন্দ প্রমুখ সঙ্গীগণকে চৈতন্যদেব নীলাচলে অবস্থান করিতে বলেন। তাঁহারা অন্ততঃ দু'একজনকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন নাই। নিত্যানন্দ বলেন যে দাক্ষিণাত্যের পথ তাঁহার জানা আছে, তিনি তাঁহাকে পথ-প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু তাহাতেও শ্রীচৈতন্যদেব সম্মত হইলেন না। অগত্যা ভক্তগণ তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই বৎসর পরে চৈতন্যদেব

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ততদিন পর্য্যন্ত নিত্যানন্দ নীলাচলে অবস্থান করেন। চৈতন্যদেব ফিরিলে নিত্যানন্দ তাঁহার প্রত্যাগমন বার্ত্তা নবদ্বীপের শচীমাতা ও ভক্তগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। গৌড়ের বৈষ্ণবগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচল আগমন করেন। বর্ষার চারিমাস নীলাচলে অবস্থান করিয়া তাঁহারা যখন গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নিত্যানন্দও সেই সঙ্গে যান। শ্রীচৈতন্যদেব বিশেষভাবে তাঁহার উপরে গৌড় দেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পণ করেন। বিদায়ের পূর্ব্বে নিভৃতে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে পরামর্শ হয়। কি বিষয়ে আলোচনা করেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ধর্ম্ম-প্রচার বিষয়েই পরামর্শ হইয়া থাকিবে।

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ পরামর্শ করিতেন। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন "তুমি বৎসর বৎসর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিও না; গৌড়ে থাকিয়া দৃঢ়চিত্তে ধর্ম্ম প্রচার কর।"

"প্রভু বোলে 'শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসা'ব প্রেমসুখে॥

তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সভার মোচন।"

চৈঃ ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এখন হইতে গৌড় দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। এই কার্য্যে রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ-বেজ-ওঝা, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস এবং পুরন্দর পণ্ডিত বিশেষভাবে তাঁহার সহযোগী মনোনীত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দ গৌড় যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যেই তিনি তাঁহাদিগকে আপনার ভাবে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। রামদাস বিশেষভাবে গোপালভাব সাধন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি হইয়া তিন প্রহর বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া একস্থানে গোপালভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। গদাধর দাস রাধিকাভাব সাধন করিয়াছিলেন। 'কে দধি লইবে' বলিয়া ডাকিতেন। রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় রেবতীভাব সাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস এবং পরমেশ্বর দাস গোপালভাবে সর্ব্বদা মত্ত থাকিতেন। পুরন্দর পণ্ডিত অঙ্গদভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া—'আমি অঙ্গদ বলিয়া' গাছে চড়িতেন। এইরূপে

ভাবে প্রমত্ত হইয়া পথ চলিতে চলিতে অনেক সময়ে তাঁহারা পথ ভুলিয়া বিপথে চলিয়া যাইতেন। ক্রমে তাঁহারা বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা পানীহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইলেন।

রাঘব পণ্ডিত বহু সমাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এখানে তিনমাসকাল অবস্থিতি করিয়া নিত্য সংকীর্ত্তনাদি করিতেন। মাধব ঘোষ নামক একজন সুগায়ক আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব তিন ভাই; তাঁহারা সকলেই কীর্ত্তনে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিন ভাই যখন কীর্ত্তন করিতেন তখন ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের কীর্ত্তনে নিত্যানন্দ প্রমত্তভাবে নৃত্য করিতেন। তাঁহার অঙ্গে অশ্রু, কম্প. পুলক, স্বেদ দেখা দিত। সঙ্গীগণ নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবে মত্ত হইয়া উঠিতেন। পানীহাটী গ্রামে নবদ্বীপের ন্যায় ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। একদিন সঙ্কীর্ত্তনের সময় নিত্যানন্দ খাটের উপর বসিয়া আদেশ করিলেন "অভিষেক কর"। রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তদনুসারে তাঁহার মস্তকে কলস কলস করিয়া গঙ্গাজল ঢালিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহাকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া দেহে চন্দন লেপন করিলেন। গলদেশে তুলসী মালা অর্পণ করিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন—"আমি কদম্বফুল বড় ভালবাসি। কদম্ব মালা আনিয়া দাও।" ভক্তগণ বলিলেন, "এখন কদম্ব ফুলের সময় নয়; তাহা পাওয়া যাইবে না।" নিত্যানন্দ বলিলেন "উদ্যানে গিয়া দেখ যদি কোন বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া থাকে।" কথিত আছে রাঘব পণ্ডিত বাগানে গিয়া দেখিলেন একটি গাছে অনেক কদম্ব ফুল ফুটিয়া আছে। রাঘব পণ্ডিত বিস্মিতহৃদয়ে কদম্ব ফুল চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া নিত্যানন্দকে আনিয়া দিলেন।

এই সময়ে আর একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ আছে। ভক্তগণ দোনাফুলের গন্ধ অনুভব করিলেন। কোথা হইতে এ গন্ধ আসিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ বলিলেন "শ্রীচৈতন্যদেব দমনক পুষ্পের মালা পরিয়া তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন। তাঁহারই শ্রীঅঙ্গের মাল্যের এই সুগন্ধ।" এই সকল ব্যাপার সম্ভবতঃ ভক্তগণের কল্পনা। পানীহাটী গ্রামে অবস্থান কালে আর একটি ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে তাঁহার অলঙ্কার পরিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ভক্তগণকে এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা বিবিধ অলঙ্কার আনিয়া দেন। হাতে সোনার বালা, দশ আঙ্গুলে নানাপ্রকারের অংটী, গলে বিবিধ মণি মুক্তার মালা, কানে দুল, পায়ে রূপার নূপুর, মস্তকে ও পরিধানে পট্টবস্ত্র, প্রভৃতি বহু মূল্যের সামগ্রী ধারণ করিলেন। লিখিত আছে সে গুলির মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা। ইহা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি। তবে তিনি এখন হইতে অলঙ্কার পরিধান করিতেন। বিরক্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা কিছু বিস্ময়কর; কিন্তু ভক্তগণ তাহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। অবশ্য কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি চৈতন্যের পরম ভক্ত। কিন্তু নিত্যানন্দের অলঙ্কার পরিধান, কর্পূর তাম্বুল ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তিনি যখন নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিতে যান, তাঁহার এই সন্দেহ তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। তদুত্তরে উদারমতি চৈতন্যদেব বলেন—"নিত্যানন্দ উচ্চ-অধিকারী। অধিকারী হইলে এরূপ ব্যবহারে কোন দোষ হয় না।" এই বাক্যে ব্রাহ্মণের সন্দেহ দূর হইয়াছিল।

এইরূপে দিনের পর দিন ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনাদি চলিতে লাগিল। তিন মাস পানীহাটীতে অবস্থান করিয়া নিত্যানন্দ সঙ্গীগণকে লইয়া

গঙ্গার তীরে তীরে নবদ্বীপ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে গ্রামে গ্রামে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, বালক বৃদ্ধ তাঁহার কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইতেন। অল্পবয়স্ক শিশুগণ পর্য্যন্ত ভাবে মত্ত হইয়া "আমি গোপাল" বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইত। পথিমধ্যে কয়েকদিন অন্তরঙ্গ পারিষদ গদাধর দাস ও পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করেন। খড়দহে পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে কিছুদিন থাকিয়া নিত্যানন্দ সদলে সপ্তগ্রাম আগমন করেন। এই স্থান গঙ্গাতীরে ত্রিবেণী ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। এখানে উদ্ধারণ দত্ত নামক একজন ধনী বণিকের বাস ছিল। নিত্যানন্দ তাঁহার গৃহে অতিথি হন। উদ্ধারণ দত্ত যে জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তৎকালীন হিন্দুসমাজে তাহা হেয় ছিল। কিন্তু নিত্যানন্দ জাতিকুল গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। নিত্যানন্দ এই বণিক জাতির প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-সমাজে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের চেষ্টায় হিন্দুসমাজের ঘৃণ্য জাতিগণের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের গৃহে নিত্যানন্দ সদলে অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন। এখানেও নিত্য প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হইত। উদ্ধারণ দত্তও অপরাপর বণিকের গৃহে গমন করিয়া মহা উৎসাহে প্রতিদিন সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। মুসলমানগণও এই সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া অশ্রুপাত করিত।

সপ্তগ্রামে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া শান্তিপুর হইয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসেন। শান্তিপুরে কোনও কাজ করেন নাই, এবং বেশীদিন ছিলেন না। সম্ভবতঃ অদ্বৈতাচার্য্য সেখানে কাজ করিতেছেন বলিয়া নিত্যানন্দ তথায় আর কিছু করেন নাই। নবদ্বীপে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে শচী মাতাকে দর্শন করেন। তিনিও নিত্যানন্দকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া

সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। নবদ্বীপ তখনও সমৃদ্ধশালী নগর। বহু লোকের বাস। বৈষ্ণব নেতাগণের মধ্যে কেহ কেহ নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। অবশিষ্ট বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে পাইয়া সুখী ও সবল হইলেন। নিত্যানন্দ অধম, পতিত, দুর্ব্বৃত্ত সকলকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কথিত আছে—সেই সময়ে নবদ্বীপে এক দুর্ব্বৃত্ত দস্যু ছিল। ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও এমন কোন দুষ্কার্য্য ছিল না যাহা সে করে নাই। তাহার একটি দল ছিল। তাহাদিগকে লইয়া চুরি ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। নিত্যানন্দের অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার দেখিয়া তাহার লোভ জন্মিল। স্থির করিল রাত্রিতে নিত্যানন্দের গৃহে পড়িয়া অলঙ্কারগুলি চুরি করিবে। নিত্যানন্দ হিরণ্য পণ্ডিত নামক একজন ব্রাহ্মণের নির্জ্জন গৃহে বাস করিতেছিলেন। ভক্তগণ ভিন্ন আর কেহ সেখানে থাকিতেন না। দস্যু সুযোগ বুঝিয়া এক রাত্রিতে তাঁহার গৃহ ঘিরিল। কিন্তু তখন নিত্যানন্দ আহার করিতেছিলেন। ভক্তগণও জাগিয়াছিলেন। তাঁহারা নিদ্রিত হইলে আক্রমণ করিবে মনে করিয়া দস্যুগণ অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তাহারা নিজেই ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যূষে দস্যুগণ পরস্পরের দোষ দিতে দিতে প্রস্থান করিল। আর এক রাত্রিতে আসিয়া তাহারা দেখিল বলবান পাইকগণ গৃহ রক্ষা করিতেছে। আর একদিন যখন তাহারা ডাকাতি করিতে আসিল তখন আকাশে ঘন মেঘ; দস্যুগণ অন্ধকারে পথ দেখিতে পায় না। খাদে, জঙ্গলে, কাঁটা গাছের উপরে পড়িয়া যাইতে লাগিল। তদুপরি শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন দস্যুগণের ক্লেশের সীমা রহিল না। বৈষ্ণব গ্রন্থকার এই সকল

ব্যাপারের মধ্যে নিত্যানন্দের দৈবী-শক্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। দস্যু-দলপতি নিত্যানন্দের প্রভাবে তাহাদের এই দুর্গতি হইয়াছে মনে করিল। পরদিন নিত্যানন্দের নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া, সকল অপরাধ স্বীকার করতঃ কৃপাভিক্ষা চাহিল। পতিত অধমদের চিরবন্ধু নিত্যানন্দ সহজেই তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি বলিলেন,

শুন বিপ্র! যতেক পাতক কৈলা তুমি।
আর যদি না কর' সে সব নিলুঁ আমি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া সব তুমি, না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥
যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথ সভারে লওয়াও তুমি গিয়া॥"

চৈঃ, ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

এই বলিয়া স্বীয় গলদেশ হইতে মালা লইয়া নিত্যানন্দ দস্যুর গলায় পরাইয়া দিলেন; দস্যু তাঁহার চরণে পড়িয়া কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। দস্যুর জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন আসিল। এখন হইতে সে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারে দিন যাপন করিতে লাগিল। তাহার চেষ্টায় বহু দস্যু দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধু জীবন যাপন করিতে লাগিল।

এইরূপে নিত্যানন্দ প্রবল উদ্যমে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ ব্যতীত খানাযোড়া, বড়গাছি, দোগাছিয়া, ফুলিয়া প্রভৃতি অনেক গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য

বিশেষ সফল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্মের বিস্তারে নিত্যানন্দের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। বহু শিষ্য তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। রামদাস প্রভৃতি সাত জন সঙ্গী ব্যতীত আরও অনেক অন্তরঙ্গ ভক্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস নিম্নলিখিত শিষ্যগণের কথা বলিয়াছেন। চৈতন্যদাস, সুন্দরানন্দ, পণ্ডিত কমলাকান্ত, গৌরীদাস পণ্ডিত, বড়গাছি নিবাসী কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বর দাস, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, বলরাম দাস, যদুনাথ কবিচন্দ্র, জগদীশ পণ্ডিত, পণ্ডিত পুরুষোত্তম, রাঢ়নিবাসী বিপ্র কৃষ্ণদাস, কালিয়া কৃষ্ণদাস, সদাশিব কবিরাজ, তাঁহার পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস, উদ্ধারণ দত্ত, মহেশ পণ্ডিত, পরমানন্দ উপাধ্যায়, চতুর্ভুজ পণ্ডিত, নন্দন গঙ্গাদাস, আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ, পরমানন্দ গুপ্ত, কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ, মহান্ত আচার্য্য চন্দ্র, গায়ক মাধবানন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, জীব পণ্ডিত, মনোহর, নারায়ণ। এই তালিকা হইতে নিত্যানন্দের প্রচার কার্য্যে সফলতার আভাস পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস স্বয়ংও নিত্যানন্দের অনুবর্ত্তী ছিলেন। নিত্যানন্দের আদেশে তিনি চৈতন্য-ভাগবত রচনা করেন এবং তাঁহার নিকটেই শ্রীচৈতন্যের জীবনীর উপাদান প্রাপ্ত হন।

এইরূপে বিপুল উৎসাহে বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া নিত্যানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঠিক কতদিন তিনি নবদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিলেন তাহা নিশ্চিত বুঝা যায় না। চৈতন্য-চরিতামৃত অনুসারে তিনি তৃতীয়াব্দে অর্থাৎ পরবর্ত্তী বৎসর গৌড়ের বৈষ্ণবগণের সঙ্গে রথযাত্রার সময় নীলাচল যান।

"তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন॥

সব মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা পরম উল্লাসে॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে, প্রেমভক্তি প্রকাশিতে॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে॥"

চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিঃ।

চৈতন্যভাগবত মতে তিনি তাঁহাদের কিছু পূর্ব্বে নিজ সঙ্গীগণকে লইয়া নীলাচলে যান। সেখানে চারিমাস থাকিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবারও আসিবার সময় শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে বৎসর বৎসর নীলাচলে আসিতে নিষেধ করেন। গৌড়ে থাকিয়া একচিত্তে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতে বলেন। তিনিও সেইরূপ করিয়াছিলেন।

ইহার পর কোন সময়ে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন, ঠিক কোন বৎসর তাঁহার বিবাহ হয় তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় চরিতামৃত ও ভাগবত উভয় গ্রন্থেই নিত্যানন্দের বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। এত বড় ঘটনার কোনও প্রসঙ্গ নাই কেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু, নিত্যানন্দের বিবাহ অবিসম্বাদী ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁহার বংশ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। নবদ্বীপ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সালিগ্রাম গ্রামে পণ্ডিত সূর্য্যদাস সরমেল নামক এক ব্রাহ্মণের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তখন নিত্যানন্দের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর হইবে। এই পরিণত বয়সে দীর্ঘকালের ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিয়া বিবাহ করা কিছু বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু, বোধ হয়, অনেকদিন হইতেই তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের প্রতি আকর্ষণ হইয়াছিল। অনেক পূর্ব্বেই সন্ন্যাস ত্যাগ

করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি ইতিপূর্ব্বে তিনি অলঙ্কার, পট্টবস্ত্র, কর্পূর, তাম্বূল প্রভৃতি বিলাসসামগ্রী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীবাস আচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন নেতাগণ এই কার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন।

"নিত্যানন্দ চন্দ্রেরে বিবাহ করাইতে।
হইল সভার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছামতে॥
* * *
শ্রীবাস পণ্ডিত মহা উল্লাসিত হৈয়া।
জানাইল সভারে অদ্বৈতাচার্য্যে কৈয়া॥
মন্দ মন্দ হাসে নিত্যানন্দ হলধর।
অন্যের দুর্গম নিত্যানন্দের অন্তর॥
বিবাহ বিষয়ে হৈল সভার উল্লাস।
বড়গাছি গ্রামে শীঘ্র গেলা কৃষ্ণদাস॥"

ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।

এই কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের একজন অনুরক্ত ভক্ত। বিবাহ বিষয়ে কৃষ্ণদাসের প্রবল উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বাড়ী বড়গাছি হইতে বিবাহের আয়োজন হয়।

নিত্যানন্দ বিবাহ করিলেন ত, দুইটি বিবাহ কেন করিলেন তাহা আর একটি সমস্যা। আমাদের মনে হয় এই বিবাহের মধ্যে কিছু রহস্য আছে। বোধ হয়, কন্যা দুইটি নিতান্ত বালিকা ছিল না। সম্ভবতঃ কোনও কারণে তাহাদের বিবাহ হইতেছিল না। সূর্য্যদাস সরখেল অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তিনি গৌড়ের রাজসরকারে চাকরী করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

"নবদ্বীপ হৈতে অল্পদূর সালিগ্রাম।
তথা বৈসে পণ্ডিত শ্রীসূর্য্যদাস নাম॥
গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সু-সমর্থ।
সরখেল খ্যাতি উপার্জ্জিল বহু অর্থ॥

* * *

শ্রীসূর্য্যদাসের গুণ কহিল না হয়।
বসুধা জাহ্নবী নামে তাঁর কন্যাদ্বয়॥
রূপে গুণে দোঁহার উপমা নাই দিতে।
দোঁহার বিবাহ লাগি সদা চিন্তে চিতে॥
বিপ্রগণে দেন ভার বিবাহ-বিষয়।
আইসে সম্বন্ধ কভু স্থির নাহি হয়॥"

ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।

এইরূপ ধনী ও সম্ভ্রান্ত পিতার, এইরূপ রূপবতী ও গুণবতী কন্যার সেকালে বিবাহের এত উদ্বেগ কেন পাইতে হইবে তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়। সম্ভবতঃ অন্যত্র বিবাহ না হওয়ায় অজ্ঞাতকুলশীল, পরিণতবয়স্ক, ভগ্ন-সন্ন্যাস-ব্রত নিত্যানন্দের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে সূর্য্যদাস পণ্ডিত সম্মত হন। দেখা যায়, তিনি সহজে বিবাহ দিতে প্রস্তুত হন নাই। একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ এই বিবাহের প্রস্তাব করেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিত সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিবাহ বিষয়ে মনস্থির করিতে স্বপ্নের সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। যেরূপেই হউক, সূর্য্যদাস পণ্ডিত নিত্যানন্দের সহিত অবশেষে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। অজ্ঞাতকুলশীল, জাতিভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর সহিত একটি কন্যার বিবাহ দিলে অপরটির বিবাহ দেওয়া আরও দুষ্কর হইবে—এই জন্যই বোধ হয় এক পাত্রের সহিত দুই কন্যার বিবাহ

স্থির হয়। বিশেষ সমারোহের সহিত বিবাহকার্য্য সু-সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

বিবাহের পর পত্নীদ্বয়কে লইয়া নিত্যানন্দ বড়গাছি আসেন। সেখানে অনুরাগী ভক্ত কৃষ্ণদাসের গৃহে কয়েকদিন যাপন করিয়া তাঁহারা নবদ্বীপে আগমন করেন। শচীমাতা নিত্যানন্দের পত্নীদ্বয়কে দেখিয়া সস্নেহে অভ্যর্থনা করিলেন। নবদ্বীপের ভক্তগণও বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপে কিছুদিন থাকিয়া নিত্যানন্দ শান্তিপুর হইয়া সস্ত্রীক সপ্তগ্রামে আসেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া খড়দহে যান। এখন হইতে নিত্যানন্দ এইখানেই স্থায়ীভাবে বাস করেন। অবশ্য সেখান হইতে বঙ্গদেশের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচারে যাইতেন। বিবাহের পরে নিত্যানন্দ কতদিন জীবিত ছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁহার সন্তানসন্ততি হইয়াছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থে বীরভদ্র নামে তাঁহার এক পুত্র ও গঙ্গাদেবী নামে এক কন্যার বিবরণ পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের বিবাহের পর খড়দহের মণ্ডলী জমাট বাঁধিয়াছিল। এখন হইতে খড়দহ বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। বহু ভক্ত আসিয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই সহধর্ম্মিণীও তাঁহার সাধন ও প্রচারের বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিত্যানন্দের মৃত্যুর পরেও অনেক বৎসর জীবিত থাকিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিশেষভাবে বৈষ্ণব ইতিহাসে জাহ্নবীদেবীর কার্য্যের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরকালে তিনি বৈষ্ণব গোস্বামীগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বহু বৎসর পরে যখন নরোত্তম দাস খেতরিতে চৈতন্যবিগ্রহ স্থাপন করেন তখন জাহ্নবীদেবী সেখানে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার

অনুমতি অনুসারে বিজ্ঞ আচার্য্য শ্রীনিবাস সমুদয় কার্য্য করেন। অবশ্য নিত্যানন্দের পত্নী বলিয়াই তাঁহাকে এই সম্মানের পদ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে বিশেষ বিচক্ষণতা ও তেজস্বিতা বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। খেতরি উৎসবের পর জাহ্নবীদেবী বৃন্দাবন গমন করেন। সেখানেও গোস্বামী ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহার প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সময়ে তাঁহার বৃন্দাবনের গোপীনাথের জন্য এক রাধিকা-মূর্ত্তি গঠনের ইচ্ছা হয়। গৌড়ে ফিরিয়া এক রাধিকামূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। ইহার পরে জাহ্নবীদেবী আর একবার বৃন্দাবন গমন করেন। তিনি গৌড়ের বৈষ্ণব-কেন্দ্র-গুলিতে অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন। একবার তিনি স্বর্গীয় পতি নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্রাতেও গিয়াছিলেন।

যতদিন জাহ্নবী দেবী জীবিত ছিলেন খড়দহের বৈষ্ণবমণ্ডলী বেশ জমাট ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র ঐ মণ্ডলীকে সতেজ রাখিয়াছিলেন। বীরচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। নিত্যানন্দের পুত্র বলিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীতে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি নিজের শক্তিতেও বিখ্যাত নেতা হইয়াছিলেন। জনশ্রুতি, বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সম্পূর্ণরূপে জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া যে আনুষ্ঠানিক সম্প্রদায় হইয়াছে বীরচন্দ্র তাহার প্রবর্ত্তক। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহাকে একজন সাহসী সংস্কারকও বলিতে হইবে। পিতামাতার ন্যায় বীরচন্দ্র সর্ব্বদাই নানাস্থানে বৈষ্ণবকেন্দ্র পরিদর্শন করিতেন। কিন্তু খড়দহেই তাঁহার স্থায়ী কার্য্যক্ষেত্র ছিল। নিত্যানন্দের ন্যায় বীরচন্দ্রেরও দুইটি বিবাহ হইয়াছিল। রাঢ়ে ঝামটপুর গ্রামে যদুনন্দন আচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বীরচন্দ্র তাঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণীকে

বিবাহ করেন। বৈষ্ণবনেতাগণ কেন যে একাধিক বিবাহ করিয়া অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। বীরচন্দ্রের তিন পুত্র, গোপীজন বল্লভ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র। তাঁহাদেরও অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল।

নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবীও বৈষ্ণব ইতিহাসে সুপরিচিত। মাধবাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদেরও অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল। নিত্যানন্দের বংশধরগণ এখনও বঙ্গদেশে নানাস্থানে বাস করিতেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার নিত্যানন্দকে চৈতন্য-বৃক্ষের প্রথম শাখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক নিত্যানন্দ ও তাঁহার বংশধরগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর একটি প্রধান স্তম্ভ।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রারম্ভে তিনজন প্রধান পুরুষের প্রভাব লক্ষিত হয়,—শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য। ইঁহাদিগের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যদেবের যখন জন্ম হয় তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধ। চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের নেতা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্য সপ্ততি বর্ষের বৃদ্ধ। অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব আমরা সর্ব্বাপেক্ষা এইখানে দেখি, যে তিনি চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পরে অকাতরে নেতৃত্বপদ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন; সপ্ততি বর্ষের বৃদ্ধ হইয়াও তিনি সমগ্র হৃদয়ে বিংশতি বর্ষের যুবকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। তাঁহার মনে ঈর্ষ্যার কোন চিহ্নমাত্র স্থান পায় নাই। অল্পবয়স হইতেই অদ্বৈতাচার্য্যের হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। চারিদিকে ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া তিনি কাতরহৃদয়ে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছিলেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, অদ্বৈতের প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্যের অবতার। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-বিধানে ব্যাপ্‌টিষ্ট্‌ জন যেমন খৃষ্টের পূর্ব্বগামী ছিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিধানে অদ্বৈতাচার্য্যের সেই স্থান।

শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউর পরগণার নবগ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। অদ্বৈতাচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নৃসিংহ মিশ্র গঙ্গা-বাসের জন্য শান্তিপুরে একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তিনি

অতি বিচক্ষণ, ধীশক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তদানীন্তন দিনাজপুরের রাজা তাঁহাকে স্বীয় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। রাজকার্য্যের জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে গৌড়দেশে বাস করিতে হইত। এইজন্য তিনি গঙ্গাতীরে একটি বাসস্থান প্রস্তুত করেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবের মিশ্র বৃদ্ধবয়সে এই পৈতৃক গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে বাস করিতেন। তিনিও একজন বিদ্বান ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন এবং নবগ্রামের রাজা দিব্যসিংহের প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি অনেকগুলি পুত্রশোক পাইয়া প্রৌঢ়বয়সে তিনি গঙ্গাতীরে ধর্ম্মচর্চ্চায় অবশিষ্ট জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে শান্তিপুর আগমন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দিব্যসিংহের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে নবগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এইখানে পিতামাতার পরিণত বয়সে অদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম লাভা দেবী। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিকা ও বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের বাল্যকাল নবগ্রামেই অতিবাহিত হয়। এখানে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। বাল্যকালেই তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, অল্প বয়সেই কৃষ্ণে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি হইয়াছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ অদ্বৈতাচার্য্যের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি এই যে, রাজা দিব্যসিংহ বালক অদ্বৈতাচার্য্যকে স্বীয় ইষ্টদেবতা কালীবিগ্রহকে প্রণাম করিতে বাধ্য করেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। রাজা দিব্যসিংহ শক্তি উপাসক ছিলেন। বালক অদ্বৈত প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্ত। এইজন্য কালীর উপাসক রাজার রাজ্যে বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অদ্বৈত স্বীয় পিতাকে শান্তিপুরে বাস করিতে অনুরোধ করেন। কুবের পণ্ডিত এই প্রস্তাবে সম্মত

হইয়া পুনরায় শান্তিপুরগমন স্থির করিলেন। দিব্যসিংহ প্রিয় মন্ত্রীর বিচ্ছেদে কাতর হইয়া কুবের পণ্ডিত ও বালক অদ্বৈতকে নবগ্রামে থাকিবার জন্য বহু অনুনয় বিনয় করেন। এমন কি, অদ্বৈতের ইচ্ছা অনুসারে শক্তিপূজা ছাড়িয়া কৃষ্ণপূজা আরম্ভ করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু, বালক অদ্বৈত কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। যে কারণেই হউক, অল্প বয়সেই অদ্বৈত স্বীয় পিতার সহিত শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন।

তাঁহার শিক্ষা প্রধানতঃ শান্তিপুরেই হইয়াছিল। অল্প বয়সেই ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ষড়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া তিনি শান্তিপুরের নিকটস্থ ফুল্লবাটী গ্রামে শান্ত ভট্টাচার্য্য নামক একজন বেদজ্ঞ আচার্য্যের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতে যান। তখন তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক বারবৎসর হইবে। বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি ভাগবত পাঠ করেন। ঠিক কত দিন তিনি শান্তাচার্য্যের নিকট ছিলেন তাহা জানা যায় না। তবে দুই বৎসরের অধিক হইবে না বলিয়া মনে হয়। কেননা, অদ্বৈতাচার্য্য ফুলবাড়ী হইতে শান্তিপুর প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার পিতামাতা পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। এক দিবসেই অদ্বৈতাচার্য্যের পিতামাতা পরলোক গমন করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ লাভাদেবী পতির সহমৃতা হন। পিতামাতার মৃত্যুতে অদ্বৈতাচার্য্য পৃথিবীর সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে গয়ায় পিণ্ড দিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে কিছুদিন পরে অদ্বৈতাচার্য্য গয়া গমন করেন। তথা হইতে তিনি নানাস্থানে তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বহির্গত হন।

অদ্বৈতাচার্য্য গয়া হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন।

প্রথমে রেমুনা আসিয়া তৎপরে পুরী যান। পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে তাঁহার মহাভাবের উদ্রেক হয়। "হা প্রাণনাথ, হা প্রাণনাথ" বলিতে বলিতে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতলে পতিত হন; পুনরায় চেতনা প্রাপ্ত হইয়া "আমি কৃষ্ণধন পাইলাম" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যাইবার ইচ্ছায় ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হন। পথে গোদাবরী, কাবেরী, শিব-কাঞ্চী, পাপনাশন, দক্ষিণমথুরা প্রভৃতি নানা তীর্থ দর্শন করিয়া বহুদিন পর সেতুবন্ধে উপস্থিত হন। রামেশ্বরেও তাঁহার ভাবাবেশের উল্লেখ আছে। এক দিবস সমস্ত রাত্রি তিনি রামায়ণ পাঠে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেতুবন্ধ হইতে পশ্চিম উপকূলে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া উলুপীতে মধ্বাচার্য্যের আশ্রমে উপনীত হন। তখন মাধবেন্দ্র-পুরী মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন। ইনি মহাপ্রেমিক; অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকিতেন। অদ্বৈতাচার্য্য যে সময়ে আশ্রমে উপস্থিত হন তখন শাণ্ডিল্য সূত্র ও নারদসূত্রের ব্যাখ্যান হইতেছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি প্রথমে উচ্ছ্বসিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হন। আশ্রমবাসিগণ আগন্তুকের অসামান্য ভাববিকার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মূর্চ্ছিত অদ্বৈতা-চার্য্যকে বেষ্টন করিয়া তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে অদ্বৈতের সংজ্ঞা হইল। তখন তিনি "ভক্তি দাও, ভক্তি দাও' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ স্থির হইলে মাধবেন্দ্র পুরীকে প্রণাম করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার নিকট ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষার প্রার্থনা জানাইলেন। মাধবেন্দ্রপুরী সানন্দে তাঁহাকে আশ্রমে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র পাঠের অনুমতি দিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য কিছুদিন আশ্রমে থাকিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট ভাগবত ও মাধবাচার্য্যের ভাষ্য অধ্যয়ন

করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই অদ্বৈতাচার্য্যের হৃদয়ে চারিদিকে ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া দারুণ বেদনা জাগিয়াছিল। এ বিষয়ে অনেক সময়ে তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত আলাপ করিতেন। মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই উভয়ের মধ্যে যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। উত্তরকালে অদ্বৈতাচার্য্য মাধবেন্দ্র-পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন; মাধবেন্দ্রপুরী তীর্থদর্শন উদ্দেশ্যে কখনও বৃন্দাবন, কখনও নীলাচল প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। একবার শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহেও আসিয়াছিলেন। কিছুদিন মধ্বাচার্য্য আশ্রমে বাসকরিয়া অদ্বৈতাচার্য্য পুনর্ব্বার তীর্থভ্রমণে বাহির হন।

ক্রমে ক্রমে দণ্ডকারণ্য, নাসিক, দ্বারকা, প্রভাস, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, গোমুখী, গণ্ডকীশালগ্রাম প্রভৃতি বহু তীর্থ দর্শন করিয়া তিনি মিথিলা আগমন করেন! এখানে কবিবর বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন অদ্বৈতাচার্য্য একটি স্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। স্বর লক্ষ্য করিয়া গমন করিয়া দেখিলেন একটি বটবৃক্ষতলে একজন ব্রাহ্মণ গান করিতেছেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রেমে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে পরিচয় হইল। অদ্বৈতাচার্য্য বিদ্যাপতির কবিত্ব ও স্বরলালিত্যের বহু স্তুতিবাদ করিলেন। বিদ্যাপতিও বৈষ্ণবোচিত দীনতা সহকারে নিজের অধমতা প্রকাশ করিলেন। মিথিলা হইতে অদ্বৈতাচার্য্য অযোধ্যা হইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। এখানে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রধান শিষ্য বিজয়পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইনি অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্ব পরিচিত। ইঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্টের নবগ্রাম। ইঁহার পিতা অদ্বৈতের মাতা

সীতাদেবীর পিতৃ-পুরোহিত। সেই সম্পর্কে অদ্বৈতাচার্য্য বিজয়পুরীকে মামা বলিতেন। এই আকস্মিক মিলনে উভয়েই অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরস্পরের বিগত ইতিহাস শ্রবণে ও কৃষ্ণ কথায় কয়েকদিন সুখে অতিবাহিত করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বারাণসী হইতে প্রয়াগ গমন করেন। প্রয়াগে কিছুদিন অবস্থান করিয়া ত্রিবেণীতে স্নান, তপস্যাদি করিয়া তিনি মথুরা যান।

মথুরা ও বৃন্দাবনে অনেকদিন থাকিয়া কৃষ্ণলীলার সমুদয় স্থান দর্শন করেন। বৃন্দাবনে অদ্বৈতাচার্য্য মদনগোপালের সেবা প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, এক রাত্রিতে মদনগোপাল স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলেন, যে, আমি যবনের ভয়ে যমুনাতীরে লুক্কায়িত আছি। তুমি গ্রামবাসীগণের সাহায্যে আমাকে বাহির করিয়া আমার সেবা প্রকটিত কর। অল্প মাটীর নীচে আমাকে পাইবে। নিদ্রাভঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্য হৃষ্টচিত্তে গ্রামবাসীগণকে ডাকিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁড়িতেই মদনগোপালের বিগ্রহ পাইলেন। ভক্তিসহকারে প্রস্তর মূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া বৃক্ষতলে তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং পূজার জন্য একজন পূজারী রাখিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে, একদল দুর্বৃত্ত যবন হিন্দু-দিগের ধর্ম্মহানির জন্য প্রতিমা অপহরণ করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া দেখিল মদনগোপাল সেখানে নাই। তখন তাহারা নিরাশ চিত্তে ফিরিয়া গেল। নিয়মিত সময়ে পূজার জন্য পূজারী আসিয়া বিগ্রহ না দেখিয়া দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। সে সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য অন্যত্র গিয়াছিলেন। তিনিও ফিরিয়া মদনগোপালকে না দেখিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। মনের দুঃখে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পুনরায় স্বপ্নে দর্শন দিয়া মদনগোপাল তাঁহাকে জানাইলেন—যবনেরা তাঁহাকে লইতে পারে নাই। তিনি

নিকটবর্ত্তী পুষ্পবনে লুক্কায়িত আছেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্য বিগ্রহ পুনরায় পূর্ব্বস্থানে সংস্থাপিত করিয়া নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করিলেন। এ সকল বিবরণের মূলে কতটুকু সত্য আছে তাহা বলা যায় না। ইহা খুব সম্ভব, যে, মদনগোপালের বিগ্রহ যমুনাতীরে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ছিল; অদ্বৈতাচার্য্য তাহা দেখিতে পাইয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে আগ্রহ হয়। তদনুসারে দীর্ঘকাল তীর্থভ্রমণের পর তিনি শান্তিপুর ফিরিয়া আসিলেন। দেখা যাইতেছে অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, চৈতন্যদেব তিনজন বৈষ্ণব নেতাই তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নানাস্থান দর্শন করিয়াছিলেন। সেকালের পক্ষে ইহা একটি কম শিক্ষা নহে। ইঁহাদের মধ্যে চৈতন্যদেবই অপেক্ষাকৃত অল্প স্থান গিয়াছিলেন, এবং নিত্যানন্দের অভিজ্ঞতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বৃন্দাবন হইতে আসিবার সময় কৃষ্ণদাস নামক একজন অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণযুবক অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গী হন। অদ্বৈতাচার্য্যের ধর্ম্মভাব দেখিয়া কৃষ্ণদাস তাঁহার নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা জানান। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন। উত্তরকালে এই যুবক অদ্বৈতাচার্য্যের প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন।

শান্তিপুরের অধিবাসিগণ দীর্ঘ তীর্থভ্রমণের পর অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া অতিশয় সুখী হইলেন। তাঁহারা অদ্বৈতাচার্য্যের শান্তিপুর বাসের উপযোগী সমুদয় আয়োজন করিয়া দিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নিয়মিত-রূপে দিবাভাগে পূজা ও রাত্রিতে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন। বহুলোক তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে ও ব্যাখ্যা শুনিতে আসিতেন। কিছুকাল পরে মাধবেন্দ্রপুরী তীর্থভ্রমণ পথে শান্তিপুর আগমন করেন। তাঁহাকে

পাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের মহা আনন্দ হইল। চৈতন্যভাগবতের বিবরণে মনে হয়, মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ। ভাগবতে মধ্বাচার্য্য আশ্রমে মিলনের কোন উল্লেখ নাই।

মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, মাধবেন্দ্রপুরী যাঁহাদিগকে দীক্ষা দিতেন তাঁহারা অদ্ভুত ভক্তিলাভ করিতেন। তাঁহার শিষ্য, অনুশিষ্যগণ মহাভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রথম সাক্ষাতের সময় মধ্বাচার্য্য আশ্রমে অদ্বৈতাচার্য্য কেন মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষিত হন নাই তাহা কিছু বিস্ময়ের বিষয়। শান্তিপুরে কিছুদিন থাকিয়া মাধবেন্দ্রপুরী নীলাচলে গমন করেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর গমন হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য অধিক ঘটনা অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনে আর দেখা যায় না। এই সময়ের মধ্যে আর একবার তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন। এ যাত্রা তিনি দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। নীলাচলের পথে শ্রীনাথ আচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার আশ্চর্য্য ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হন। নীলাচলেও বহুলোক অদ্বৈতাচার্য্যের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পুরুষোত্তম ও কামদেব নামক দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হন। শুভদিনে তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের সময়ে তাঁহাদিগকে লইয়া শান্তিপুর আসেন। এখন হইতে অদ্বৈতাচার্য্য পূর্ব্বের মত ধর্ম্মসাধন ও শাস্ত্রচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত

হইল। একবার শ্যামদাস নামে একজন দ্রাবিড় দেশীয়, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্য্যের পাণ্ডিত্যের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত বিচার করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। ক্রমে বহুলোক তাঁহার শিষ্য হন। যদুনন্দন তর্কচূড়ামণি নামক একজন জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত এবং শ্যামদাস আচার্য্য নামক একজন রাঢ় দেশীয় বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে আনীত ব্রাহ্মণযুবক কৃষ্ণদাসকেও দশ বৎসর ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিবার পর এই সময় দীক্ষিত করেন। এই কালের মধ্যে কোন সময়ে যবন-কুলোদ্ভব মহাভক্ত হরিদাস ঠাকুর আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মিলিত হন। হরিদাস ঠাকুরের মিলনের সময় তিনি তরুণবয়স্ক যুবক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে দেখিয়া বলেন,—"আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমাকে জানি।" সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বেই হরিদাসের কঠোর পরীক্ষা ও নির্য্যাতনের সংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন। হরিদাসের আন্তরিক ব্যাকুলতা ও প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে রাখিলেন। নির্জ্জন গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্য একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। হরিদাস ক্রমে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন ও ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার নিকট ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। অদ্বৈতাচার্য্য যবন হরিদাসের সংসর্গ করেন বলিয়া শান্তিপুরবাসিগণ তাঁহাদের উভয়ের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করেন। কথিত আছে, অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসের দ্বারা অলৌকিক ঘটনা করাইয়া শান্তিপুরবাসিদিগের নির্য্যাতন বন্ধ করেন।

এইরূপে বহু সম্মান ও প্রতিপত্তির মধ্যে অদ্বৈতের জীবন

অতিবাহিত হইতে লাগিল। শান্তিপুরের অধিবাসিগণ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

"শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বিবাহ করাইতে।
বিশিষ্ট লোকের চেষ্টা হৈল ভাল মতে ॥
সকলেই কৈলা বিবাহের আয়োজন।
তাহা জানিলেন প্রভু কুবের নন্দন ॥
করিতে বিবাহ অদ্বৈতের ইচ্ছা হৈল।
মন্দ মন্দ হাসি সবে অনুমতি দিল ॥"

ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।

যে সময়ে মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনিও অদ্বৈতাচার্য্যকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আরও কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা করিয়া পরে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিব। ঠিক কোন সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য বিবাহ করেন তাহা নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না। বৈষ্ণব ইতিহাসে সন, তারিখের বড়ই অভাব। তবে মনে হয়, পরিণত বয়সেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কেননা, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সন্তান হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান অচ্যুতানন্দ যখন চারি বৎসরের বালক তখন অদ্বৈতাচার্য্যের বয়স ৭৬ বৎসর। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের ন্যায় ইনিও একত্রে দুই ভগিনীর পাণি-গ্রহণ করেন। নৃসিংহ ভাদুড়ী নামক একজন ব্রাহ্মণের সীতা ও শ্রী নাম্নী দুইটি কন্যা ছিল। অদ্বৈতাচার্য্য এক সঙ্গে এই দুইটি কন্যাকেই বিবাহ করেন। সেই সময়ে এইরূপ দুই বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। অদ্বৈতাচার্য্যের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ-মিশ্র, শ্রীগোপাল, বলরাম, জগদীশ এই পাঁচ জনের নাম উল্লেখ আছে।

এই সময় অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করান। সম্ভবতঃ অধ্যাপনার জন্য নবদ্বীপে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বাস করিতে হইত। তৎকালে নবদ্বীপ জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপের জ্ঞানধারার সহিত যোগ রাখিবার জন্য তথায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে ও পরে অনেক সময়ে তিনি নবদ্বীপে বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। বালক চৈতন্য ও বিশ্বরূপের সহিত মধ্যে মধ্যে তাঁহার টোলে আসিতেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপের বৈষ্ণবদলের নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্বলোকে ধন্য॥
জ্ঞানভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার।
সর্ব্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তি সার॥
তুলসী মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতুহলে॥"

চৈঃ ভাঃ, আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

এই সকল বিবরণ প্রথম খণ্ডে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। পুনরুল্লেখদোষসত্ত্বেও আবার অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনী সম্পর্কে এই স্থানে কিছু কিছু বলিতে হইল।

এখন হইতে অদ্বৈতাচার্য্য অনেক সময় নবদ্বীপেই বাস করিতেন। ক্রমে নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হইল। তাঁহারা তাঁহাকে পাইয়া সবল হইলেন।

"প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত আচার্য্য স্থানে করেন গমন॥
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য গোসাঞি।
জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ ভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ তপোধর্ম্ম নাহি মানে আন॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করেন বৈষ্ণবগণ।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণপূজা নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"

চৈতন্য চরিতামৃত।

নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের অনেকেই সাধারণ লোক ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের মত একজন জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ লোক পাইয়া তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত হইলেন। অদ্বৈতগৃহ তাঁহাদের একটি মিলনের স্থান হইল। অদ্বৈতাচার্য্য সময়ে সময়ে শ্রীবাসের গৃহে বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইতেন। এই সময়ে নবদ্বীপের বৈষ্ণবদল "অদ্বৈত-সভা" নামে অভিহিত হইত। জগন্নাথ মিশ্রের সহিত অদ্বৈতাচার্য্যের পরিচয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, জগন্নাথ মিশ্র উপর্য্যুপরি অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যু হওয়াতে পরম ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের শরণাপন্ন হন। তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া, সস্ত্রীক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন।

একদিকে যেমন অদ্বৈতসভার দলপুষ্টি হইতে লাগিল, অপরদিকে তাঁহাদের বিরোধীদলও তেমনি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা সরল, বিনয়ী বৈষ্ণবদিগকে বিদ্রূপ ও নানাপ্রকার উপদ্রব করিত। বিরোধীগণের ব্যবহারে ভক্তদল ক্ষুণ্ণ হইতেন। তাঁহারা মনের দুঃখে ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা ও একান্তে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সভাকার॥
কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন।
আপনা আপনি সভে করেন কীর্ত্তন॥
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত-সভায়।
কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে সভার দুঃখ যায়॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি, করয়ে ক্রন্দন॥
দুঃখ ভাব অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥"

চৈঃ ভাঃ ২য় অধ্যায়।

বিশেষরূপে অদ্বৈতাচার্য্য সঙ্কল্পগ্রহণ করিয়া তুলসী ও গঙ্গাজলে কৃষ্ণপূজা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন অদ্বৈতের হুঙ্কারে শ্রীচৈতন্যের অবতার।

"এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥"

* * * *

"কৃষ্ণশূন্য মণ্ডলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত বড় পায় মনে দুঃখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
'মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এসকল জীবের উদ্ধার'॥

* * *

নিরবধি এই মত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এক চিত্ত হৈয়া॥"

চৈঃ ভাঃ ২য় অধ্যায়।

অদ্বৈতাচার্য্য দুর্ব্বল, নিরাশ ও বৈষ্ণবদিগকে যথাসাধ্য আশ্বাস দিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ বলেন, কৃষ্ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবেন, একথা তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি জগন্নাথ মিশ্রের শিশু পুত্র নিমাইকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাকে লইয়া নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। এ সকল স্পষ্টই উত্তরকালের ভক্তগণের কল্পনা। চৈতন্যভাগবতে এ সকলের বিশেষ উল্লেখ নাই। তবে, অদ্বৈতাচার্য্য জগন্নাথ মিশ্রের সহিত পরিচিত ছিলেন, সুতরাং শিশুর জন্মের সময় তিনি তাঁহার বাড়ী আসিয়া থাকিতে পারেন। তৎপরে অনেকদিন বালকের আর কোনও সংবাদ রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ তাঁহার টোলে পড়িতেন; বালক তাঁহাকে ডাকিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইত। ইহার অধিক আর কোন পরিচয় ছিল না।

শ্রীচৈতন্যদেব গয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ বিস্মিত এবং আনন্দিত হইয়া এ সংবাদ তাঁহাদের নেতা অদ্বৈতাচার্য্যকে দিলেন। তিনিও এই সুসংবাদে পরম আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিছুদিন পরে, একদিন বিশ্বম্ভর তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত, সহাধ্যায়ী গদাধরের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্য তুলসীমূলে বসিয়া পূজা অর্চ্চনা করিতেছিলেন; ভাবে মত্ত হইয়া, তিনি হরি হরি বলিয়া হুঙ্কার ও বাহু আস্ফালন

করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়াই বিশ্বম্ভর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরের মহাভাবের কথা পুর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এখন স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবজনোচিত দীনতা সহকারে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। উত্তরকালে ভক্ত-জীবনচরিত লেখক ইহার মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তিযোগ-প্রভাবে জানিতেপারিলেন, বিশ্বম্ভর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এবং তদনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনায় একথার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। অল্পক্ষণ পরেই, সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বিশ্বম্ভরও অদ্বৈতাচার্য্যকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন; তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিনয়সহকারে বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। আমি আপনার দাস, আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনার হৃদয়ে কৃষ্ণ নিরন্তর বিরাজ করেন। আপনি ভববন্ধন মোচন করিতে পারেন।"

"নমস্কার করি তাঁর পদধূলি লয়ে।
আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয়ে॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়!
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥
তুমি সে করিতে পার' ভব-বন্ধ-নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রকাশ॥"

চৈঃ, ভাঃ, মধ্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরের বৈষ্ণবোচিত দীনতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "নবদ্বীপে থাকিয়া কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে দিন যাপন কর। মধ্যে

মধ্যে যেন সাক্ষাৎ পাই। তোমাকে দেখিতে বৈষ্ণবগণের একান্ত ইচ্ছা।” বিশ্বম্ভর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

বিশ্বম্ভরের সহিত পরিচয়ের অল্পদিন পরেই অদ্বৈতাচার্য্য স্বীয় প্রথানুসারে শান্তিপুর গমন করেন। এদিকে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব দিন দিন ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একে একে নানাস্থান হইতে ভক্তগণ নবদ্বীপে আসিয়া বৈষ্ণবদলের পরিপুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপ আসিয়া বৈষ্ণব-মণ্ডলীর সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীবাসের মন্দিরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। স্বভাবতঃই শ্রীচৈতন্যদেব ইচ্ছা করিতে লাগিলেন, প্রবীণ বৈষ্ণবনেতা অদ্বৈতাচার্য্য এই সময়ে নবদ্বীপে বাস করেন। তিনি তাঁহাকে আনিবার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরামকে শান্তিপুর প্রেরণ করেন। শ্রীরাম শ্রীচৈতন্যের আদেশ অনুসারে অদ্বৈতাচার্য্যকে নবদ্বীপের নূতন ভক্তি তরঙ্গের বিবরণ ও নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ দিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য এই সুসংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। চৈতন্যদেবের সাগ্রহ আহ্বানে সপরিবারে নবদ্বীপ আগমন করিলেন। বৈষ্ণবলেখকগণ ইহার মধ্যেও এক রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যদেবের অনুরোধে নবদ্বীপ আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিলেন; এবং রামাই পণ্ডিতকে বলিয়া দিলেন, তুমি গিয়া বল, অদ্বৈতাচার্য্য আসিলেন না। রামাই পণ্ডিত তাহাই করিলেন। চৈতন্যদেব তখন বলিলেন, “নাড়া আমার সহিত চাতুরী করিতেছে। সে আমার ঠাকুরালি দেখিতে চায়। আমি জানি সে নন্দনাচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া আছে। তাহাকে শীঘ্র আসিয়া আমার পূজা করিতে বল।” অদ্বৈতাচার্য্য এই সংবাদ শুনিয়া পূজার দ্রব্য

সহিত সস্ত্রীক আসিয়া চৈতন্যদেবের চরণপূজা করেন। তিনি পিতামহের বয়স্ক, বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের মস্তকে আপনার 'পা' উঠাইয়া দিলেন। বিনয়ের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষে এরূপ ব্যবহার শোভন বা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। এ সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার মনে করিতেন কিনা সন্দেহ। তবে হইতে পারে, এখন হইতে তিনি তাঁহাকে বৈষ্ণবগণের নেতারূপে গ্রহণ করিলেন। এই বিবরণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, অদ্বৈতাচার্য্য স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি ঘৃণিত, অধম, দীনের প্রতি অতিশয় দয়ার্দ্র ছিলেন। এই সকল হেয় ব্যক্তিগণকে প্রেমভক্তি বিলাইবার জন্য তিনি প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবকে অনুরোধ করেন। চৈতন্যদেব যখন তাঁহাকে বর লইবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্য স্ত্রী, শূদ্রের জন্য করুণা ভিক্ষা করেন।

"অদ্বৈত বলেন "যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গান গায়্যা॥"

চৈঃ ভাঃ, মধ্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

এখন কিছুদিন অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া বৈষ্ণবদলের সংকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। চৈতন্যদেবও তাঁহাকে সাতিশয় সম্মান করিতেন। কিন্তু তথাপি উভয়ের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অদ্বৈতাচার্য্যের প্রকৃতি সংসার-প্রবণ। তাঁহার ব্যবহারে চৈতন্যদেব

মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইতেন। একদিন এইরূপ বিরক্ত হইয়া ভাবপ্রধান চৈতন্যদেব দেহত্যাগ করিবার জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। হরিদাস এবং নিত্যানন্দ নিকটে ছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। তিনি দুঃখিত অন্তরে বৈষ্ণবদল পরিত্যাগ করিয়া একদিন নন্দনাচার্য্যের গৃহে সমস্ত দিন লুক্কায়িত রহিলেন। অদ্বৈত নিজের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া সমস্ত দিন উপবাসী থাকিলেন। পরদিন চৈতন্যদেব এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার গৃহে গমন করিলেন, এবং আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন "আমার প্রকৃতি এইরূপ; তুমি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হইও না। আমি অহঙ্কারী, আমাতে ভক্তি-ভাব স্ফূর্ত্তি পায় না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

"অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বোল মোরে, সব প্রভু, বাহ্য॥
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি॥
সভারে উত্তম দিয়া আছ দাস্যভাব।
মোয়ে দিয়াছহ প্রভু! যত কিছু রাগ॥

*　　　*　　　*

হেন কর' প্রভু! মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া॥"

চৈঃ ভাঃ, মধ্যখণ্ড, ১৭শ অধ্যায়।

সে দিনের মত মেঘ কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যের প্রকৃতিগত সংশয় সময়ে সময়ে মাথা তুলিত। সেইজন্য চৈতন্যদেবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মনোমালিন্য জন্মিত। বৈষ্ণবলেখকগণ তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই, অথবা নিজেরা বুঝিতে পারেন নাই; তথাপি

তাঁহাদের বিবরণের মধ্যে এই প্রকার বিরোধের ছায়া স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

কিছুদিন নবদ্বীপে থাকার পর অদ্বৈতাচার্য্য কোন কাজের ওজর করিয়া, বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন ছাড়িয়া, শান্তিপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে তিনি ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞানের প্রাধান্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

"নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বাশিষ্ঠ-শাস্ত্র 'জ্ঞান' প্রকাশিয়া ॥
"জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সভার প্রাণ 'জ্ঞান' সর্ব্বশক্তি ॥
হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া, চাহে গিয়া বন ॥
'বিষ্ণুভক্তি' দর্পণ, লোচন হয় 'জ্ঞান'।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম ?
আদি বৃদ্ধ আমি পড়িলাঙ সর্ব্বশাস্ত্র।
বুঝিলাঙ সর্ব্ব-অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র ॥"

চৈঃ ভাঃ, মধ্যখণ্ড, ১৯শ অধ্যায়।

লোকমুখে চৈতন্যদেব এই সংবাদ পাইয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য নিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে শান্তিপুর গমন করিলেন। অদ্বৈত-ভবনে আসিয়া দেখিলেন তিনি সোৎসাহে জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইহা শুনিয়াই তিনি ক্রোধে অগ্নিপ্রায় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলত জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে বড় কি ?" অদ্বৈত উত্তর করিলেন "সকল সময়েই জ্ঞান বড়। জ্ঞান না থাকিলে ভক্তিতে লাভ

কি ?" এই উত্তরে ক্রোধে অন্ধ হইয়া চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্য্যকে সবলে অঙ্গনে নামাইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন।

"ক্রোধমুখে বোলে প্রভু "আরে আরে নাঢ়া !
বোল দেখি 'জ্ঞান' 'ভক্তি' দুইতে কে বাঢ়া ?"
অদ্বৈত বোলয়ে "সর্ব্ব-কাল বড় 'জ্ঞান'।
যার 'জ্ঞান' নাহি তার ভক্তিতে কি কাম ॥"
"জ্ঞান বড়" অদ্বৈতের শুনিঞা বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন ॥
পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥"

চৈঃ ভাঃ, মধ্য খণ্ড, ১৯শ অধ্যায়।

নিত্যানন্দ, হরিদাস ও অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী এই ব্যাপার দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইলেন। সীতাদেবী বলিতে লাগিলেন "বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রহার করিও না।" ক্ষণকাল পরে শান্ত হইয়া চৈতন্যদেব উপবিষ্ট হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বুকে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে অদ্বৈতগৃহে ভক্তির তরঙ্গ বহিতে লাগিল। চৈতন্যদেব স্বীয় ব্যাপারে লজ্জিত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সীতাদেবীকে আহারের আয়োজন করিতে বলিলেন।

কিছুদিন শান্তিপুরে থাকিয়া অদ্বৈতাচার্য্য ও হরিদাসকে লইয়া শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ নবদ্বীপ প্রত্যাগমন করিলেন। নবদ্বীপে পুনর্ব্বার প্রেম ভক্তির তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে অদ্বৈতাচার্য্য পুনরায় শান্তিপুর গমন করিয়া থাকিবেন। কেননা,

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের সময়ে তিনি নবদ্বীপে ছিলেন না। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যকে কোন কথা বলার উল্লেখ নাই। সন্ন্যাসের পরে নীলাচলের পথে চৈতন্যদেব কয়েকদিন শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অবস্থিতি করেন। নবদ্বীপের ভক্তগণ সেখানে চৈতন্যদেবকে দেখিতে আসেন। তিনি যে ভাবে ভক্তগণের আতিথ্য সৎকার করেন, তাহাতে মনে হয় তাঁহার আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে যে কয়জন অন্তরঙ্গ ভক্ত নীলাচল গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন না। দুই বৎসর পরে দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন করিয়া চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে দর্শনের জন্য নীলাচলে যান। অদ্বৈতাচার্য্য এই দলের নেতা ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তখন তাঁহার বহু সমাদর করেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করেন। চৈতন্যদেব তখন সন্ন্যাসী। সেইজন্যই বোধহয় অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার চরণবন্দনা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরও শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। এখন হইতে বৎসর বৎসর গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী চৈতন্যদেবের সহিত মিলনের জন্য নীলাচলে আসিতেন। বার বৎসর এইরূপ দলবদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবগণের আগমনের বিবরণ পাওয়া যায়। অদ্বৈতাচার্য্য এই দলের প্রধান ছিলেন। এখন তাঁহার বয়স আশী বৎসরের উপর হইয়া থাকিবে। এই বৃদ্ধবয়সে পদব্রজে দূর ও সঙ্কটজনক পথ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে আগমন কি গভীর ভক্তির পরিচয় তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। কয়েক বৎসর পরে

শ্রীচৈতন্যদেব যখন গৌড়ে পুনরাগমন করেন তখন তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতার্য্যের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পর অদ্বৈতাচার্য্য অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। ঠিক কোন সময়ে তিনি পরলোকগমন করেন তাহা জানিতে পারা যায় না। আমরা বলিয়াছি বৈষ্ণবইতিহাসে সন তারিখের বড় অভাব। এমন কি প্রধান প্রধান নেতাগণের মৃত্যুসময় জানিতে পারা যায় না। অদ্বৈতাচার্য্যের মৃত্যুর আনুমানিক সময় এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যে, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য যে সময় শান্তিপুর যান তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোভাব হয়। ইহাতে মনে হয় চৈতন্যদেবের মৃত্যুর অল্পদিন পরে অদ্বৈতাচার্য্য পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক একশত বৎসর।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী।

শ্রীচৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত ভক্তিধারার জন্মস্থান নবদ্বীপ এবং বঙ্গদেশেই তাহার সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গদেশে একটি বৃহৎ এবং বর্দ্ধনশীল মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত এই মণ্ডলী নবদ্বীপেই আবদ্ধ ছিল। তাঁহার সন্ন্যাসের পর বৈষ্ণবমণ্ডলী দ্রুতবেগে নবদ্বীপের বাহিরে প্রসারিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং উড়িষ্যায়, নীলাচলে বাস করেন, এবং সেখানে একটি মণ্ডলী গঠিত হয়। তিনি নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাওয়ায় তথাকার মণ্ডলী কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আরও কোন কোন ভক্ত এই সময়ে অন্যান্য স্থানে গিয়া অবস্থিতি করেন। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দ্দেশানুসারেই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রচারপ্রথা এই প্রকারের ছিল। বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য এখন হইতে শান্তিপুরেই বাস করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রথমে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্যদেব তাঁহার উপর বিশেষভাবে বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পণকরতঃ তাঁহাকে তথায় পাঠান। এখন হইতে নিত্যানন্দ বিপুল উৎসাহে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি নবদ্বীপ কেন্দ্র করিয়া কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া খড়দহে তাঁহার প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করেন। কেন যে তিনি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন, তাহার কোন নিশ্চিত সংবাদ জানিতে পারা যায় না। বোধ হয়, নবদ্বীপ অপেক্ষা খড়দহ তাঁহার নিকট ধর্ম্মপ্রচারের

সুবিধা-জনক স্থান বলিয়া মনে হইয়াছিল। এইরূপে অন্যান্য নেতাগণও একে একে নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করেন। যিনি যখন যেখানে যাইতেন সেইখানেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইত। তাঁহাদের চারিদিকে এক একটি ভক্তমণ্ডলী গড়িয়া উঠিত। এইরূপে বঙ্গদেশের নানাস্থানে প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল স্থানে নবদ্বীপ, শান্তিপুরের ন্যায় নিত্য সঙ্কীর্ত্তন, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রব্যাখ্যা হইত। স্থানীয় লোকগণ এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিত; অন্যান্য স্থান হইতেও বৈষ্ণবগণ আসিয়া দলপুষ্টি করিতেন। মধ্যে মধ্যে নিত্যানন্দপ্রমুখ নেতাগণ এই সকল কেন্দ্রে গিয়া স্থানীয় লোকদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

যদিও অনেকগুলি প্রধান ভক্ত নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র গিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তথাপি বহুদিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপ বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রধান কেন্দ্র ছিল। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া গেলেও অনেকে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের মধ্যে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতের পরেই শ্রীবাস পণ্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই তিনি সপরিবারে বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধন করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহই বৈষ্ণব-দিগের মিলনের স্থান ছিল। "শ্রীবাসের অঙ্গন" বৈষ্ণব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় স্থান। ইহাকে ভক্তিধর্ম্মের উৎস বলা যাইতে পারে। শ্রীবাসের বৃহৎ পরিবার। শ্রীরামপণ্ডিত, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি নামে তাঁর তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যের অনুরক্ত। শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবী শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরমানুরাগী। নিত্যানন্দ নবদ্বীপ অবস্থানকালে ইঁহাদের গৃহেই থাকিতেন। তিনি মালিনীদেবীকে মা বলিয়া ডাকিতেন। ইঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল

ছিল বলিয়া মনে হয়। উত্তরকালে শ্রীবাস কুমারহট্টে একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপেও তাঁহার অবস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি কখনও নবদ্বীপ, কখনও কুমারহট্টে বাস করিতেন। কুমারহট্ট বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি প্রচারকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে গমনাগমন সময়ে কিছুদিন কুমারহট্টে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীবাসাচার্য্য কেন যে তথায় বাস করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্যও অদ্বৈতাচার্য্যের ন্যায় তাঁহারও আদিম নিবাস শ্রীহট্ট বলিয়া লিখিত আছে।

নবদ্বীপের আদিম বৈষ্ণবগণের মধ্যে গদাধরপণ্ডিত একজন প্রধান। ইনি শ্রীচৈতন্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন বিদ্যারসে গর্ব্বিত ছিলেন, গদাধর পণ্ডিত সেই সময় হইতেই বৈষ্ণব-দলে যোগ দিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন। পরে যখন তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তন হইল এবং তিনি বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন গদাধরের আনন্দের সীমা রহিল না। এখন হইতে গদাধরপণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। উত্তরকালে চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন তখন গদাধর পণ্ডিতও তাঁহার নিকটে থাকিবার জন্য তথায় অবস্থান করিলেন। সেখানে তিনি চৈতন্যদেবকে নিত্য ভাগবতপাঠ করিয়া শুনাইতেন। পাঠ করিতে করিতে তিনি এতই ক্রন্দন করিতেন যে, চোখের জলে গ্রন্থ ভিজিয়া যাইত। যতদিন চৈতন্যদেব জীবিত ছিলেন, গদাধর পণ্ডিত নীলাচলেই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোভাবের কিছুদিন পরে গদাধরপণ্ডিতও পরলোক গমন করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে আর একজন প্রধান ভক্ত হরিদাস ঠাকুর। ইঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথমখণ্ডেই প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবদলে যোগ দিবার পূর্ব্বেই, হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মিলিত হন। শান্তিপুরে থাকিয়া তাঁহার নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও উত্তরকালে চৈতন্যদেবের নিকটে অবস্থানের জন্য নীলাচলে বাস করেন। মুসলমান বংশে জন্ম বলিয়া তিনি মন্দিরের সন্নিকটে বাস করিতেন না; শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার বাসস্থানের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে নগরপ্রান্তে একটি নির্জ্জন কুটীর চাহিয়া লইয়াছিলেন। র এখানে থাকিয়া একান্তে ধর্ম্মসাধনা করিতেন। চৈতন্যদেব াখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং ন্দের হস্তে তাঁহার আহার্য্য প্রেরণ করিতেন। গভীর জন্য মুসলমান হইয়াও হরিদাস ঠাকুর বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ন লাভ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য একবার তাঁহার াদ্ধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ভোজ্য । ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইলে অদ্বৈতাচার্য্য বলেন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তিনি জানেন না। চৈতন্যদেবের ার বহু পূর্ব্বেই হরিদাসঠাকুর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেব অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃতদেহ কোলে লইয়া অনেক ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তৎপরে নীলাচলের বৈষ্ণবমণ্ডলীর সহিত মহা সমারোহে সমুদ্রতীরে তাঁহাকে সমাধিস্থ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত মুকুন্দ দত্ত। ইনি অতি সু-গায়ক ছিলেন। ইঁহারা দুই ভ্রাতা; জ্যেষ্ঠের নাম বাসুদেব দত্ত।

উভয়েই বৈষ্ণবধর্ম্মে পরম অনুরাগী। বাসুদেব দত্তের ধর্ম্মভাবের পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে, যে, তিনি বলিতেন জগতের সকল পাপীর পাপভার তাঁহাকে দিয়া যদি তাঁহাদিগকে মুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা লইয়া নরকে যাইতে প্রস্তুত আছেন। মুকুন্দ চৈতন্যদেবের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ প্রমুখ যে পাঁচজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তাহা জ্ঞাপন করেন, মুকুন্দ তন্মধ্যে একজন। তৎপরে যে তিনজন তাঁহার পশ্চাতে কাটোয়া যান তাহার মধ্যে মুকুন্দের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, এবং নীলাচল গমনকালে যে চারিজন ভক্ত তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন, মুকুন্দ তন্মধ্যে অন্যতম। ইহা পারা যায়, যে মুকুন্দ চৈতন্যদেবের কিরূপ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছি মধুর কীর্ত্তনে তিনি চৈতন্যকে মুগ্ধ করিতেন।

চৈতন্যদেবের প্রথম বয়সের সঙ্গী, আর একজন ভক্ত ইনি জাতিতে বৈদ্য, আদিম নিবাস চট্টগ্রাম। মুরারী গু সহাধ্যায়ী ছিলেন। ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া ঠিক উত্ত তিনি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, ব্যাকরণ পড়া নয়, গাছপালা লইয়া ঔষধ প্রস্তুত কর গিয়া। উত্তরকালে চৈতন্যদেবের পরম বিনয়ী ভক্ত হইয়াছিলেন। গৌড়ের সঙ্গে তিনি যখন নীলাচলে যান সেই সময়ে চৈতন্যে আলিঙ্গন করিতে গেলে তিনি বিনয়ে পশ্চাৎপদ হইয়াছি বৈদ্যের ব্যবসা করিতেন, কিন্তু কাহারও নিকট অর্থ চাহিতেন না। স্বেচ্ছায় যে যাহা দিত তাহার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।

গৌড়ের বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে একজন প্রাচীন নেতা চন্দ্রশেখর আচার্য্য। সাধারণের মধ্যে তিনি আচার্য্যরত্ন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প স্থির হইলে চৈতন্যদেব যে কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তাহা জ্ঞাপন করেন, চন্দ্রশেখর আচার্য্য তাঁহাদের মধ্যে অন্য একজন। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের সময়ে কাটোয়াতেও গিয়াছিলেন।

আর একজন প্রবীণ ভক্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিত। কীর্ত্তন সময়ে তিনি সুন্দর নৃত্য করিতেন। কথিত আছে, একভাবে তিনি চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিতে পারিতেন। চৈতন্যদেব তাঁহার নৃত্য বড় ভালবাসিতেন। বক্রেশ্বর বলিতেন দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব যদি কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাঁহার নৃত্য করিয়া সুখ হয়। উত্তরকালে ইনি নীলাচলে অবস্থান ...বং চৈতন্যদেবের পরলোকগমনের পরে তাঁহার আসন

...র আর একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। ... একবার তাঁহার গৃহে চাহিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ...চ দরিদ্র ছিলেন। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলে দিনাতিপাত করিতেন। ...সেই অন্নেই পরম পরিতোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

...ন্থকারিগণ আর একজন দরিদ্র বৈষ্ণবকে অমর করিয়া... তিনি শ্রীধর দাস। থোড়, মোচা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া ...র যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এই জন্য তিনি খোলাবেচা ... বৈষ্ণবমণ্ডলীতে পরিচিত হইয়াছিলেন। হৃদয়-পরিবর্ত্তনের ...ন্যদেব তাঁহার নিকট জোর জবরদস্তী করিয়া কলা মোচা প্রভৃতি কাড়িয়া লইতেন। উত্তরকালে তিনি শ্রীধরকে স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবদলে সম্মানিত স্থান দিয়াছিলেন। শ্রীধর তাঁহার পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। যে রাত্রিশেষে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করেন সেদিন অনেক রাত্রিতে শ্রীধর একটি ভাল লাউ পাইয়া

চৈতন্যদেবকে উপহার দেন। পাছে ভক্ত মনে কষ্ট পান এইজন্য অনেক রাত্রিতেও শ্রীচৈতন্য জননীকে তাহা রন্ধন করিতে বলেন।

এতদ্ভিন্ন গঙ্গাদাস পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খান, পুরন্দর আচার্য্য, শঙ্কর পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, নারায়ণ পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, নন্দন আচার্য্য, শ্রীমান্ সেন, নকুল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু ভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। যদিও অনেক প্রধান নেতা নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তথাপি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপ বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রধান কেন্দ্র ছিল। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও আদিলীলার স্থান বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকটে নবদ্বীপ হইয়াছে। যতদিন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জীবিত দূরান্তর হইতে বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে নবদ্বীপে কেবল চৈতন্যদেবের সম্পর্কে নহে, তাঁহাদের নিজ চরি তাঁহারা সকলের গভীর ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহা নামে একজন ভৃত্য ছিল। সে চৈতন্যদেবের বাল্যক পরিবারের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। যতদিন শচীমাতা ও দেবী জীবিত ছিলেন ঈশান তাঁহাদের অনুগত দাস ছিল দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। উত্তরকালে বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট পূর্ব্বকাহিনী শ্রবণ করিতেন।

নবদ্বীপের পরেই শান্তিপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রধ ছিল। এখানেও বহু বৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য্যের সন্নিকটে বাস ক...... কৃষ্ণদাস, কমলাকান্ত বিশ্বাস, যদুনন্দন আচার্য্য, ভাগবত আচার্য্য, দুর্লভ বিশ্বাস, বনমালী দাস, জগন্নাথ কর, যাদব দাস, শ্রীবৎস পণ্ডিত, বৈদ্যনাথ, হরিচরণ প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব অদ্বৈতের অনুগত শিষ্য ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পাঁচ পুত্র, অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, শ্রীগোপাল মিশ্র,

বলরাম ও জগদীশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর সুবিখ্যাত। ইহারা বংশপরম্পরা ধরিয়া শান্তিপুরে ভক্তিধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচার করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের দুই পত্নী, শ্রী ও সীতাদেবী অদ্বৈতাচার্য্যের পরলোক-গমনের পরেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর পরম শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য স্বয়ং যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন শান্তিপুর বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতিশীল কেন্দ্র ছিল। তাঁহার পরলোকগমনের পরে অচ্যুতানন্দ শান্তিপুরের মণ্ডলীর নেতা হন।

...হ গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর তৃতীয় প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হইয়া উঠে। ... পরে নিত্যানন্দ যখন খড়দহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন ... বৈষ্ণব তাঁহার নিকট অবস্থানের জন্য নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ...রেন। তাঁহার পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-ইতিহাসে ... নিত্যানন্দের দুই স্ত্রী বসু ও জাহ্নবী গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ...। ইহাদের মধ্যে জাহ্নবী দেবী নিত্যানন্দের পরলোক-...রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয়া হইয়াছিলেন। তিনি ...বার বৃন্দাবন গিয়াছিলেন এবং গৌড়দেশের নানাস্থানে ভ্রমণ ...বৈষ্ণবগণকে উৎসাহিত করিতেন। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম-...প্রধানতঃ নিত্যানন্দের কার্য্য। এই প্রদেশের নানাস্থানে ...লাক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে মাধব ঘোষ ...র দুই ভ্রাতা বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। চৈতন্যদেব যখন নিত্যানন্দকে গৌড়ে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন তখন যে কয়জন বৈষ্ণবকে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন মাধব ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। তিনি অতি সুগায়ক ছিলেন। সর্ব্বদা নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কীর্ত্তন করিতেন। বাসুদেব

ও গোবিন্দ ঘোষও সুন্দর গান করিতেন। তদুপরি বাসুদেব সুকবিও ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু পদাবলী আছে।

নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও খড়দহ ব্যতীত বঙ্গদেশের নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক কেন্দ্র হইয়াছিল। এই সকল স্থানে বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতির বিগ্রহ গঠন করিয়া ধর্ম্মসাধনের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। কাটোয়ায়, যেখানে শ্রীচৈতন্য কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন, অল্পদিন মধ্যেই সেখানে এইরূপ একটি আশ্রম হয়। এই আশ্রমে চৈতন্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল গদাধর দা কাটোয়ামণ্ডলীর প্রথম নেতা ছিলেন। তাঁহার পরে যদুনন্দ স্থান অধিকার করেন। কাটোয়ার আশ্রম বহুদিন পর্য্যন্ত ভক্তি ধারা প্রবাহিত রাখিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত সেই মন্দির আছে।

কাটোয়ার অদূরবর্ত্তী শ্রীখণ্ড গ্রামে আর একটি বৈষ্ণবমণ্ডলী উঠিয়াছিল। শ্রীখণ্ডের মণ্ডলী বৈষ্ণব ইতিহাসে সুবিখ্যাত। অনেকগুলি গভীর ধর্ম্মভাবসম্পন্ন বৈষ্ণব কার্য্য করিয়াছিলেন বৎসর গৌড়বাসী যে সমুদয় বৈষ্ণব নীলাচল যাইতেন তা খণ্ডবাসী অনেক বৈষ্ণবের নাম দেখা যায়।

> "খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
> নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥"

চৈঃ চঃ, আদিলীলা, ১০ম পরিঃ।

ইহাদের মধ্যে নরহরি দাস প্রথম ও প্রধান। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। উত্তরকালে তিনি 'সরকার ঠাকুর' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি সুললিত পদাবলী রচনা

করিয়াছিলেন। নরহরি সরকারের পর রঘুনন্দন শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতা হন। গভীর ধর্মভাব ও অকৃত্রিম ভাগবত ভক্তির গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র কানাই ঠাকুর শ্রীখণ্ডের মহান্ত হন। তিনিও পরম ভক্ত ছিলেন। কানাই ঠাকুরের দুই পুত্র, মদন ও বংশীধর। মদন বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণবধর্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং সুন্দর কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। এইরূপে বংশপরম্পরা ধরিয়া শ্রীখণ্ডে ভক্তিধারা সুরক্ষিত হইয়াছিল। এখনও শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবধর্মের একটি কেন্দ্র। কিন্তু তাহার পূর্ব্বের প্রভাব আর নাই।

বষ্ণব ধর্মের আর একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। শ্রীচৈতন্যের ণ্ডিত গৌরীদাস এই মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা। ইনি পণ্ডিত খলের ভ্রাতা। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে তিনি গৌরীদাসকে নিজহস্তে লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ছিলেন। অন্য এক সময়ে নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়া দী পার হইয়াছিলেন তাহা গৌরীদাসকে দিয়া বলেন— দিগকে ভবনদী পার কর। শ্রীচৈতন্যের গীতা ও বৈঠা অম্বিকামণ্ডলীতে রক্ষিত হইয়াছিল। গৌরীদাস নবদ্বীপ মকাঠ আনিয়া তদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের প্রতিমূর্ত্তি য়া অম্বিকায় স্থাপন করে। এই চৈতন্যমূর্ত্তি অতি প্রাচীন। গৌরীদাস অনেকদিন পর্য্যন্ত গভীর ভক্তির সহিত এই মূর্ত্তি পূজা করেন। তৎপরে তাঁহার শিষ্য হৃদয়চৈতন্যের উপর বিগ্রহ রক্ষার ভার দেন। হৃদয়চৈতন্যের পূর্ব্ব নাম হৃদয়ানন্দ। পণ্ডিত গদাধর তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। গৌরীদাস গদাধর পণ্ডিতের নিকট হইতে তাঁহাকে চাহিয়া লন। এখন হইতে

হৃদয়চৈতন্য অম্বিকায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি গৌরীদাসকে বিগ্রহসেবার কার্য্যে সাহায্য করিতেন। একবার চৈতন্যজন্মতিথির কিছুদিন পূর্ব্বে গৌরীদাস অন্যত্র যান। জন্মতিথি সন্নিকট হইল। কিন্তু গৌরীদাস ফিরিলেন না। হৃদয়ানন্দ কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে জন্মতিথি পূজার আয়োজন করিলেন। নানাস্থানের বৈষ্ণবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনের একদিন পূর্ব্বে গৌরীদাস ফিবিয়া আসিয়া নিমন্ত্রণ কথা শুনিলেন। কোন আয়োজন নাই, অথচ বৈষ্ণবদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে ইহাতে গৌরীদাস অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হৃদয়ানন্দকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি গঙ্গা বসিয়া রহিলেন। কথিত আছে, এমন সময়ে একজন মহাজন করিয়া উৎসবের সামগ্রী উপস্থিত করিলেন। হৃদয়ানন্দ এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয় সামগ্রী লইয়া তাহাকেই উৎসব করিতে বল। অগত্যা তাহাই করিলেন। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণ আসি হইলেন। গঙ্গাতীরে উৎসবের আয়োজন হইল। বৈষ্ণব হইয়া মহা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন ও নৃ লাগিল। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সে নৃত্যে যোগ দিলেন। গৌরীদাস ভোগ দিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বিগ্রহ নাই। ক্রোধে অধীর হইয়া গৌরীদাস যষ্টি হস্তে আসিলেন, তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ পলায়ন করিয়া সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। গৌরীদাস এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধের পরিবর্ত্তে পরম স্নেহ ও আনন্দভরে হৃদয়ানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে হৃদয়চৈতন্য নাম প্রদান করিলেন। এই বিবরণ

উত্তরকালে ভাবুক কবির কল্পনা মাত্র। তবে গৌরীদাস হৃদয়ানন্দের অসাধারণ চৈতন্যভক্তি ও ভগবৎনির্ভর দেখিয়া—কোন সময়ে তাঁহাকে হৃদয়চৈতন্য নাম দিয়াছিলেন ইহা সম্ভব। গৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাবের পরে দীর্ঘকাল হৃদয়চৈতন্য অম্বিকা আশ্রমের মহান্ত ছিলেন। উত্তরকালে উড়িষ্যার শক্তিশালী বৈষ্ণবনেতা শ্যামানন্দ ইহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

পানিহাটি গ্রামে আর একটি বৈষ্ণবমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। পাণিহাটি খড়দহের সন্নিকট; নবদ্বীপ হইতে নীলাচল যাইবার পথের উপরে। বৈষ্ণবগণ নীলাচলে যাতায়াতের সময় পাণিহাটি হইয়া চৈতন্যদেব ও নীলাচলে গমনাগমন কালে এখানে কিছুদিন [illegible]য়াছিলেন। এই মণ্ডলীর নেতা রাঘব পণ্ডিত সপরিবারে [illegible] অতিশয় অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। প্রতি বৎসর গৌড়ীয় [illegible]ন নীলাচলে যাইতেন রাঘব পণ্ডিত তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেন [illegible]ন্তের প্রিয় খাদ্য সমূহ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার [illegible] সমস্ত বৎসর ধরিয়া সেই সমুদয় খাদ্য প্রস্তুত করিতেন, [illegible]লে সেগুলি একটি থলিতে পুরিয়া সঙ্গে লইতেন। বৈষ্ণব [illegible]ই থলি রাঘবের ঝুলি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পদব্রজে দীর্ঘপথ খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া কত গভীর ও সুমিষ্ট প্রেমের তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চৈতন্যদেবও পরম খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেন এবং সযত্নে রক্ষা করিয়া প্রতিদিন কিছু কিছু ভক্ষণ করিতেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করিতেন চারিস্থানে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হইত। তাহার মধ্যে রাঘবের গৃহ একটি।

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে॥

এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা, ২য় পরিঃ।

নীলাচল পথের আর একটি কেন্দ্র কুমারহট্ট (বর্ত্তমান কুমার হাটি) প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীবাস পণ্ডিত এখানে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি নবদ্বীপ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থানে কুমারহট্ট একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

কুলীন গ্রামে আর একটি বৃহৎ এবং শক্তিশালী বৈষ্ণবকেন্দ্র ছিল। বৈষ্ণব ইতিহাসে কুলীনগ্রামবাসী বৈষ্ণবগণের পুনঃ পুনঃ উল্লে পাওয়া যায়। সত্যরাজ খান, রামানন্দ, যদুনাথ, পুরুষোত্তম বিদ্যানন্দ ও বাণীনাথ বসু প্রভৃতি বহু অনুরাগী বৈষ্ণব এখা করিতেন। তাঁহারা প্রতি বৎসর দলবদ্ধ হইয়া চৈতন্যদেবকে (জন্য নীলাচল যাইতেন। তাঁহাদের উপরে জগন্নাথের রথ পট্টডড়ি লইয়া যাইবার আদেশ ছিল। চৈতন্যদেব কুলীন বৈষ্ণবদিগকে অতিশয় প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বলি কুলীন গ্রামবাসী বৈষ্ণবেরা দূরে থাকুক, কুলীন গ্রামের কুকুরও প্রিয়।

"প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর।
কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়
শূকর চরায় ডোমে সেহো কৃষ্ণ গায়॥"

চৈঃ চঃ, আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীরে সপ্তগ্রামে আর একটি বৃহৎ বৈষ্ণবমণ্ডলী গঠিত

হইয়াছিল। এখানে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রভাবই অধিক পরিমাণে কাজ করিয়াছিল। সপ্তগ্রামে অনেক স্বর্ণ বণিকের বাস ছিল। তৎকালীন হিন্দুসমাজে তাঁহারা হেয় ছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে মণ্ডলীতে গ্রহণ করিয়া সমাদর করেন। উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামের প্রধান অধিবাসী।

নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী বড়গাছী গ্রামে আর একটি বৃহৎ বৈষ্ণবমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। ইহাও নিত্যানন্দের প্রচারের ফল। তিনি অনেক সময়ে নবদ্বীপ হইতে এইখানে আসিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেন। বড়গাছি নিবাসী কৃষ্ণদাস তাঁহার একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। ...র বিবাহের একজন প্রধান উদ্যোগী।

...কটবর্ত্তী সালিগ্রামেও একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইয়া... ...ন্দের শ্বশুর সূর্য্যদাস সারখেল ও তাঁহার ভ্রাতাগণ ...তেন। নিত্যানন্দের বিবাহের পরে এখানে বৈষ্ণব ...বশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। স্বয়ং সূর্য্যদাস সারখেল ...হইয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের নানাস্থানে অনেক বৈষ্ণবের উল্লেখ দেখিতে ...। চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামে একজন প্রেমিক ... করিতেন। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার প্রারম্ভে তিনি ...বদ্বীপ আসেন। মনে হয় গঙ্গাতীরে বাসের জন্য ... তাঁহার একটি বাড়ী ছিল। তিনি অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার গৃহে বহু দাস দাসী ও বিবিধ বিলাস দ্রব্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনী হইলেও তিনি একজন অকৃত্রিম ভক্ত ছিলেন। বাহিরে তাঁহার সাজসজ্জা ও বিলাস দেখিয়া লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। তিনি যখন প্রথম নবদ্বীপ আসেন

তাঁহার স্বদেশবাসী বৈষ্ণব মুরারী গুপ্তের সহিত পণ্ডিত গদাধর তাঁহাকে দেখিতে আসেন। তিনি শুনিয়াছিলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি একজন মহাভক্ত। কিন্তু তাঁহার সাজ সজ্জা দেখিয়া গদাধরের মনে অশ্রদ্ধা জন্মিল। মুরারী গুপ্ত তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া ভাগবত হইতে একটি শ্লোক পড়িলেন। তাহা শুনিয়া বিদ্যানিধি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পতিত হইলেন। তখন গদাধর পণ্ডিত নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং প্রথম অশ্রদ্ধাজনিত অপরাধ স্খালন করিবার জন্য উত্তরকালে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব বিদ্যানিধির পরিবর্ত্তে পুণ্ডরীককে "প্রেমনিধি" আখ্যা দিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক কখনও চট্টগ্রাম কখনও নবদ্বীপ এবং কখনও শ্রীচৈতন্যের নিকটে উৎব
করিতেন।

শিবানন্দ সেন গৌড়ের আর একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব।
যে বৈষ্ণবদল গৌড় হইতে শ্রীচৈতন্যকে দেখিবার জন্য নীলা
শিবানন্দ সেন তাঁহাদের পথ প্রদর্শক ছিলেন। উড়িষ্যার
সুপরিচিত ছিল। তাঁহার নেতৃত্বে যাত্রীদল নির্ব্বিঘ্নে র্ডা
পথ অতিক্রম করিতেন। শিবানন্দ সেন চৈতন্যদেবের
ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতেও তাঁহার বহু সম্মান
তাঁহার তিন পুত্র, চৈতন্য দাস, রামদাস আর কবি কর্ণপু
সকলেই চৈতন্যদেবের অনুরাগী ভক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত
কর্ণপুর চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন

এইরূপে গৌড়ের নানাস্থানে বৈষ্ণবমণ্ডলী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মণ্ডলী আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল। পরে তাহার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

উৎকলের বৈষ্ণবমণ্ডলী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রধানতঃ বঙ্গদেশেই আবদ্ধ ছিল। ইহার বাহির কেবলমাত্র উৎকলে ইহা প্রসার লাভ করিয়াছিল। উড়িষ্যা বঙ্গদেশের পার্শ্বে, এবং উভয় প্রদেশের মধ্যে গতায়াত ছিল। উভয় দেশের ভাষার মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য আছে। তদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেব শেষ জীবনে বহু বৎসর উৎকলে বাস করিয়াছিলেন। এই সকল ড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎকলে বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঙ্গে তাঁহার অনেক সঙ্গী নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিয়া ছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রতিবৎসর বহু বৈষ্ণব চৈতন্যদেবকে ন্য গৌড় হইতে নীলাচলে আসিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান ইহাদের জীবনের প্রভাবে অনেক উৎকলবাসীও বৈষ্ণব-য়াছিলেন। এই প্রকারে উৎকলে একটি নাতিক্ষুদ্র মণ্ডলী হল।

বর নবদ্বীপের সঙ্গীগণের মধ্যে পণ্ডিত গদাধরের নাম রখযোগ্য। ইনি শ্রীচৈতন্যের উৎকল আগমনের অল্পদিন নিকট থাকিবার জন্য নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া উৎকলে তদবধি শ্রীচৈতন্যের পরলোক গমন পর্য্যন্ত ইনি তাঁহার নিকটেই ছিলেন। ইনি পরম ভক্ত ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত ছিলেন। প্রতিদিন শ্রীচৈতন্যদেবকে ভাগবত পড়িয়া শুনাইতেন। ভাগবত পাঠ করিতে করিতে তাঁহার এত অশ্রুপাত হইত যে, গ্রন্থের পাতা ভিজিয়া যাইত। শ্রীচৈতন্যের পরলোকগমনের কিছুদিন পরে ইনিও ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বঙ্গদেশের আর একজন বৈষ্ণব চৈতন্যদেবের সঙ্গে উৎকল আসিয়া বাস করেন। তিনি যবন কুলতিলক হরিদাস। তাঁহার জীবন-কাহিনী পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রথম বৎসর যখন তাঁহাকে দেখিতে নীলাচলে আগমন করেন, হরিদাসও সেই সঙ্গে আসেন; এবং স্থায়ী-ভাবে তথায় বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেব নগরের বাহিরে একটি পুষ্পোদ্যানে তাঁহার বাসের জন্য কুটীর নির্দ্দেশ করিয়া দেন। যতদিন জীবিত ছিলেন হরিদাস এই কুটীরেই বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে পরলোক গমন করেন।

নবদ্বীপের সঙ্গী আর একজন বৈষ্ণব নীলাচলে বাস ক
তাঁহার নাম স্বরূপ দামোদর। ইঁহার পূর্ব্বনাম পুরুষো
চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই সময়ে সংসারে
তিনিও বারাণসী গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।
তাঁহাকে বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে বলেন। f
আচার্য্য ভক্তিপথাবলম্বী।

"পরম বিরক্ত তিঁহো পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণচরিত।"

চৈঃ চঃ, মঃ লীঃ, ১০ঃ

নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণভজন করিবেন বলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ ক
বেদান্তে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। এইজন্য গু...
লইয়া নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এখন হইতে স্বরূপদামোদর নীলাচলেই বাস করিতে

লাগিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে অতিশয় প্রীতি করিতেন। তিনি অতি সুগায়ক ছিলেন।

"সঙ্গীত গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥"

চৈঃ চঃ, মঃ লীঃ, নবম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যদেবকে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলী গান করিয়া শুনাইতেন। বিরহ উন্মাদকালে স্বরূপের গান তাঁহাকে সান্ত্বনা দিত। চৈতন্যচরিতামৃতে রাধার সহিত তাহার সখী ললিতার যেরূপ সম্বন্ধ শ্রীচৈতন্য ও স্বরূপদামোদরেরও সেইরূপ সম্বন্ধ এইরূপ বর্ণিত

"পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ॥"

অন্ত্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ন্যদেব তাঁহাকে মনোবেদনা অকপটে বলিতেন।

"রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দ লঞা।
আপন মনের কথা কহে উঘারিয়া॥"

চৈঃ চঃ, অঃ লীঃ, ১৪শ পরিচ্ছেদ।

পর আর একটি কার্য্য ছিল গ্রন্থপরীক্ষা। কেহ কোন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট আনিলে অগ্রে স্বরূপ রীক্ষা করিতেন। তিনি অনুমোদন করিলে চৈতন্যদেবের নিকট তাহা পাঠ করা হইত। যতদিন শ্রীচৈতন্য ইহলোকে ছিলেন স্বরূপ-দামোদর তাঁহার নিকটেই বাস করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে তিনি স্বরূপদামোদর নামে পরিচিত।

নীলাচলের আর একজন সঙ্গী পরমানন্দ পুরী। তীর্থপর্য্যটনকালে

দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখনই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং নীলাচলে একত্র বাসের প্রস্তাব করেন; চৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসেন পরমানন্দপুরী সে সময়ে নবদ্বীপ। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদে পুরী গোঁসাই তাড়াতাড়ি নীলাচলে আসিলেন এবং তদবধি সেখানে চৈতন্য-দেবের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

নীলাচলের সঙ্গী গৌড়ীয় ভক্তগণের মধ্যে আর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জগদানন্দ পণ্ডিত। জগদানন্দ চৈতন্যদেবকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। শ্রীচৈতন্যও তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি করিতেন। উভয়ের মধ্যে অনেকসময় প্রণয়-ক
চৈতন্যদেবের সহিত জগদানন্দের সম্বন্ধের শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভাম
সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

"জগদানন্দে প্রভুর চলে এই মতে।
সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা, ১২শ

জগদানন্দ চৈতন্যদেবের প্রতি অনেক আবদার করি
মাতার সংবাদ লইবার জন্য চৈতন্যদেব জগদানন্দকে মধ্যে ম
প্রেরণ করিতেন। একবার গৌড়ে অবস্থানকালে শিবা
গৃহে সুগন্ধি চন্দন তৈল দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের জন্য তাহা ল
জগদানন্দের ইচ্ছা হইল। তিনি এক কলস সুগন্ধি তৈল প্রস্ত ... নীলাচল আনিলেন, এবং ভৃত্য গোবিন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, প্রতি দিন একটু একটু করিয়া মস্তকে দিবে। গোবিন্দের মুখে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দনের প্রস্তাব শুনিয়া চৈতন্যদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী; তৈলে অধিকার নাই; বিশেষতঃ

সুগন্ধি তৈল। জগদানন্দকেও এই কথা বলিয়া জগন্নাথের মন্দিরে প্রদীপে ব্যবহারের জন্ম সেই তৈল পাঠাইতে উপদেশ দিলেন।

"জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা, ১২শ পরিচ্ছেদ।

জগদানন্দ এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে বলিলেন "কে বলিল আমি তোমার জন্ম তৈল আনিয়াছি।" তদনন্তর গৃহাভ্যন্তর হইতে তৈলপাত্র আনিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং গৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। তিন দিন দ্বার খোলা হইল না। তখন শ্রীচৈতন্য গৃহদ্বারে গিয়া বলিলেন, দ্বার খোল, এবং উঠিয়া রন্ধনের [illegible] কর। আজ তোমার গৃহে আমি ভিক্ষা করিব। ইহাতে [illegible]নন্দের ক্রোধ দূর হইল। আর একবার ভূমিতে শয়ন করিতে [illegible]দেবের জীর্ণদেহে ব্যথা লাগে দেখিয়া জগদানন্দ শিমূলের তুলা [illegible] প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার ব্যবহারের জন্য গোবিন্দের [illegible]। কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাও গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে [illegible]নন্দ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া, তিনি [illegible] শুষ্ক খোলা নখে চিরিয়া দুইখানি বহির্বাসে ভরিয়া গদির [illegible] করিলেন। জগদানন্দের একান্ত আগ্রহে চৈতন্যদেব ইহা ব্যবহার করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও জগদানন্দের ক্ষোভ গেল না। [illegible] দেখিয়া দুঃখে ও ক্রোধে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যান। কিন্তু চৈতন্য-বিরহে সেখানেও থাকিতে পারিলেন না। কিছু দিন পরে পুনরায় নীলাচল প্রত্যাগমন করিলেন।

এতদ্ভিন্ন বক্রেশ্বর, রঘুনাথ বৈদ্য ও রঘুনাথ দাস প্রভৃতি আরও কয়েকজন গৌড়ের ভক্ত নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন।

উৎকলবাসী যে সমুদয় ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম সর্ব্ব প্রথম। নীলাচলে অবস্থিতি করিলেও তাঁহার আদিম নিবাস গৌড়। প্রথম বয়সে উৎকলে আসিয়া বাস করেন এবং উড়িষ্যার রাজার সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন। চৈতন্যদেব যেদিন প্রথমে পুরীতে পদার্পণ করেন সেদিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। মন্দিরে জগন্নাথ দেখিয়া শ্রীচৈতন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার ভক্তিধর্ম্মে আস্থা হয় নাই। তিনি জ্ঞানপথাবলম্বী বৈদান্তিক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে ভক্তি-পথাবলম্বী জানিয়া প্রথমে তাঁহাকে অবজ্ঞাই করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার সংস্পর্শে ও ধর্ম্মালোচনায় অল্পদিন মধ্যেই বৈষ্ণব[illegible] গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াছিলে[illegible]

উৎকলবাসী আর এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রামানন্দ রায়। ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে [illegible] কথা বহুবার বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের [illegible] তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথমে বাসুদেব সার্ব্ব[illegible] বৈষ্ণব বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। পরে যখন শ্রীচৈতন্যে[illegible] সংস্পর্শে আসিয়া স্বয়ং ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি রামানন্দে[illegible] মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন। সে সময়ে রামানন্দ রায় অন্ধ্রপ্রদেশের শাসনকর্ত্তারূপে বিদ্যানগরীতে বাস করিতেছিলেন। চৈতন্যদেব যে সময়ে দাক্ষিণাত্য গমন করেন, বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিদ্যানগরীতে তাঁহাদের মিলনের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে গভীর ধর্ম্মালাপের বিষয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে

বিবৃত করিয়াছেন। ভক্তজীবনচরিত লেখক সেই অমৃতোপম ভক্তিতত্ত্ব চৈতন্যদেবের অনুপ্রাণনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ পাঠক তাহাতে রায় রামানন্দের গভীর ধর্ম্মজীবন ও ভক্তি-তত্ত্বাভিজ্ঞতার পরিচয় পান। শ্রীচৈতন্যদেবও রামানন্দের অদ্ভুত ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নিকটে পাইবার জন্য সত্বর বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলাচলে গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে চৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই রামানন্দ রায় নীলাচলে আসেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেইখানেই বাস করেন। প্রতিদিন শ্রীচৈতন্যের নিকট আসিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। চৈতন্যদেব যখন বিরহে অধীর হইতেন তখন রামানন্দের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ তাঁহাকে না দিত।

"রামানন্দের কৃষ্ণ কথা স্বরূপের গান।
বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদনা॥
তাঁর সুখ হেতু সঙ্গে রহে দুইজনা।
কৃষ্ণ-রস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌর সুখদান হেতু তৈছে রামরায়॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

চৈতন্যদেব রামানন্দকে এত শ্রদ্ধা করিতেন, যে, তিনি বলিয়াছিলেন—

নির্ব্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥"

চৈঃ চঃ, অঃ লীঃ, ৫ম পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণবগ্রন্থে তিনি ইন্দ্রিয় সংযমের আদর্শ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের সঙ্গ বৈষ্ণবগণের নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপের জন্য ছোট হরিদাসকে চৈতন্যদেব চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই দুঃখে তিনি প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অথচ দেখা যায়, রায় রামানন্দ স্বহস্তে গায়িকাগণের অঙ্গ মার্জ্জন, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সম্প দিয়াছেন; তথাপি তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবগণের কোনও নাই। তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

"কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী স্পর্শে রায়ের তৈছে স্বভাব॥"

চৈঃ চঃ, অঃ লীঃ, ৫ম

উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্রকেও শ্রীচৈতন্যের ভ করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহার প্রগা প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা জগতে তাহা বিরল। রাজা প্রতাপরুদ্র সশি নীলাচলে অবস্থানের সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ... গণের প্রতি আদেশ ছিল চৈতন্যদেব যখন যাহা ইচ্ছা করিবেন তখনি তাহা পূর্ণ করিয়া দিবে।

উৎকলবাসী আর একজন বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবগ্রন্থে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। তিনি শিখি মাইতি। চৈতন্যচরিতামৃতে 'লিখন অধিকারী' বলিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময়ে চৈতন্যদেবের

নিকটে থাকিতেন। বৈষ্ণবগণ বলেন, জগতে সাড়ে তিনজন ভক্তির অধিকারী ছিলেন। রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখি মাইতি এই তিন পাত্র, এবং শিখি মাইতির ভগ্নী মাধবী দেবী অর্দ্ধ পাত্র।

"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকারগণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাইতি তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধ জন॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

এ অতি উচ্চ সম্মান। রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদরের সহিত শিখি মাইতিকে এখানে সমান আসন দেওয়া হইয়াছে।

শিখি মাইতির ভগ্নী মাধবী দেবী উৎকলের বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে স্মরণীয়। অপর কোন নারীকে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে এত উচ্চস্থান দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে অর্দ্ধ পাত্র বলা হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহাকে বৃদ্ধা তপস্বিনী ও পরম বৈষ্ণবী বলা হইয়াছে।

"মাইতির ভগিনী সেই নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

উৎকলের আর একজন অনুরাগী ভক্ত কাশী মিশ্র। ইনি রাজা প্রতাপ রুদ্রের গুরু। রাজা তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। রাজার নিয়ম ছিল, যখন তিনি পুরীতে থাকিতেন প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আসিয়া কাশী মিশ্রের পাদ সম্বাহন করিতেন।

"প্রতাপ রুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যত দিন রহে তিঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে॥

নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদ সম্বাহন।
জগন্নাথের সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ॥”

চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যদেবের নীলাচল আগমনের সময় হইতেই কাশী মিশ্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা করেন। শ্রীচৈতন্যের বাসস্থানের জন্য আপনার একখানি গৃহ প্রদান করেন।

ভবানন্দ রায় উৎকলের বৈষ্ণবমণ্ডলীর আর একজন প্রধান ব্যক্তি। রায় রামানন্দ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। রামানন্দ ভিন্ন তাঁহার অ. পুত্র ছিল। চৈতন্যদেব পাঁচ ভ্রাতাকে পঞ্চপাণ্ডব এবং ভ: তাঁহার পত্নীকে পাণ্ডব ও কুন্তী বলিতেন। ভবানন্দের পুত্র সরকারে বড় চাকরী করিতেন। চৈতন্যদেব নীলাচলে আগ: ভবানন্দ সপরিবারে তাঁহার ভক্ত হন।

“সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি॥
রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর লক্ষণ॥
নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে।
আত্ম সমর্পিল আমি তোমার চরণে॥”

চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ তাঁহার পুত্র বাণীনাথকে শ্রীচৈতন্যের সেবার জন্য অর্পণ করেন। বাণীনাথ সর্ব্বদা চৈতন্যদেবের নিকটে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন।

"এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে॥
প্রভু কহে কি সঙ্কোচ নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর॥"

চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ পরিবারের সহিত চৈতন্যদেবের গাঢ় প্রেমের সম্বন্ধ হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব যতদিন জীবিত ছিলেন উৎকলবাসী বহু ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার তিরো- ধানের উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান

ী সময়ে শ্যামানন্দ নামে একজন উৎকলবাসী ভক্ত স্বদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক। উড়িষ্যার অন্তর্গত :রন্দা গ্রামে ইহার জন্ম। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা শ্যামানন্দের পূর্ব্বে তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান শৈশবেই ।তিত হয়। নবজাত শিশুর জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া শের পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা তাঁহার নাম রাখিলেন দুখী। বাল্যকালে তিনি দুখী নামেই পরিচিত ছিলেন। দুখী বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অল্প বয়সেই ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী হন। প্রথম হইতেই তাঁহার ধর্ম্মে অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসী লোকের নিকটে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শুনিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হন। পিতামাতা তাঁহার

মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ করিতে তিনি গৌড়ে গিয়া কোনও বৈষ্ণব-ভক্তের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ইহাতে বেশী আপত্তি করিলেন না। তবে দুখীর বয়স অল্প. গৌড়দেশ দূর পথ; তবে উৎকল হইতে অনেক তীর্থযাত্রী গঙ্গাস্নানের জন্য গৌড়ে যাইতেন। তাঁহাদের এক দলের সঙ্গে গৌড়ে গমন করিয়া অম্বিকা নগরে তত্রত্য মহান্ত হৃদয়চৈতন্যের নিকটে দুখী বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হৃদয়চৈতন্য তাঁহার ধর্ম্মভাব দেখিয়া দুখী নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদাস নাম প্রদান করেন। এখন হইতে তিনি দুখীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হইলেন। হৃদয়চৈতন্য কৃষ্ণদাসকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। অনেকদিন নি কৃষ্ণদাসকে বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা ও ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ করান তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে উপদেশ দেন। তদনুসার অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন। শ্রী নরোত্তমের বৃন্দাবন আগমনের অল্পদিন পরেই কৃষ্ণদাস পৌঁছিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত পরিচয় ও ক্রমে বন্ধুত্ব হয়। শ্রীজীবগোস্বামী এই তিনটি যুবককে বিশেষ সহিত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করান। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণ শ্যামানন্দ নাম দিয়া স্বদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য উৎকলে করেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ একত্রেই বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পথে গ্রন্থচুরি হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য গ্রন্থান্বেষণের জন্য বিষ্ণুপুর যাওয়ায় নরোত্তম ও শ্যামানন্দ মেতরী আসেন। তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া শ্যামানন্দ উৎকল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি কয়েকদিন অম্বিকাতে অবস্থান করেন। হৃদয়চৈতন্য

তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন নিজ সন্নিধানে রাখিয়া গোস্বামীগণের আদেশমত তাঁহাকে স্বগ্রামে পাঠাইয়া দেন। শ্যামানন্দ ধারেন্দা পৌঁছিয়া বিপুল উৎসাহে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যে অনেকে তাঁহার শিষ্য হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে মুরারী ও রসিকানন্দ প্রধান। ইহারা দুই ভ্রাতা। ধারেন্দার অনতিদূরে সুবর্ণরেখা নদী-তীরস্থ রয়নী নামক গ্রামে ইঁহাদের বাস। পিতার নাম অচ্যুত। শ্যামানন্দের অদ্ভুত ভক্তি ও উন্নত জীবন দেখিয়া দুই ভ্রাতা তাঁহার নিকটে বৈষ্ণবধর্ম্মে ...গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে মুরারী ও রসিকানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্মের ...া প্রচারক হইয়া উঠিলেন। আর এক ব্যক্তি এই সময়ে ...ন্দের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার নাম দামোদর। ...প্রথমে যোগী ছিলেন। শ্যামানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ জন্মে। শ্যামানন্দ এই সকল শিষ্যগণের সহিত প্রবল ... বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে ... ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। ...গ শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর যাজপুর ও খেতরী ...া করিয়াছিলেন শ্যামানন্দ উৎকলে তাহাই করিলেন। ক্রমে ... তাঁহার শিষ্য হয়। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। রাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, মনোহর, চিন্তামণি, বলভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর, উদ্ধব, অক্রুর, মধুবন, শ্রীগোবিন্দ, জগন্নাথ, গদাধর, শ্রীআনন্দানন্দ এবং শ্রীরাধামোহন। শ্যামানন্দের সময়ে এবং পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত ধারেন্দা একটি বর্দ্ধিষ্ণু বৈষ্ণব-মণ্ডলী ছিল। ঠাকুর নরোত্তম পুরী হইতে প্রত্যাগমনের পথে একবার ধারেন্দা আসিয়া কয়েকদিন অবস্থিতি করেন। শ্যামানন্দ একাধিক-

বার গৌড়ে গমনাগমন করেন। খেতরী মহোৎসবে তিনি সশিষ্যে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে গৌড় ও উৎকলের বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ হইয়াছিল। শ্যামানন্দ ও তাঁহার শিষ্যগণের চেষ্টায় উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম 'যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। গৌড়ের বাহিরে একমাত্র উৎকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম মূলগ্রহণ করিয়াছিল। এখনও উৎকল প্রদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয়।

রূপ-সনাতন ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী।

মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্ম্মান্দোলনগুলি স্ব স্ব জন্মপ্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। শিখধর্ম্ম পাঞ্জাবে, কবীরের ধর্ম্মচেষ্টা মধ্যভারতে, তুকারামের ধর্ম্মভাব পশ্চিম ভারতের সীমা অতিক্রম করে নাই। সেইরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম্ম বঙ্গদেশ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী উৎকলেই আবদ্ধ ছিল। ভাষার অনৈক্য ও গতায়াতের অসুবিধা ইহার প্রধান কারণ। ...াহিরে একটি মাত্র স্থানে ঐ ধর্ম্মের কেন্দ্র হইয়াছিল, তাহা ... কিন্তু এখানেও এই ধর্ম্ম স্থানীয় লোকেদের মধ্যে প্রসার ... নাই। গৌড়ীয় উপনিবেশের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ...ল। চৈতন্যদেবের নির্দ্দেশে বাঙ্গালাদেশ হইতে বংশপরম্পরা ...নেকগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। ... হিন্দু তীর্থস্থানগুলিতে স্বীয় ধর্ম্মের এক একটি প্রচার কেন্দ্র ...ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং ...ল আসিয়া বাস করেন। সম্ভবতঃ প্রথমে তাঁহার বৃন্দাবনে ...র ইচ্ছা ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার সেস্থানে যাইবার ...দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসের পরে তিনি বৃন্দাবন যাইবেন ...াই বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও কারণে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করেন। মনে হয় জননী শচী দেবী ও গৌড়ীয় ভক্তমণ্ডলীর অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকিবার উদ্দেশ্যে তিনি নীলাচলে বাসই স্থির করেন। তথাপি বৃন্দাবনের প্রতি চিরদিনই তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল।

নিজে তথায় অবস্থান করিতে না পারিলেও অনেকগুলি প্রধান ভক্তকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে লোকনাথকে তথায় যাইতে আদেশ করেন। যশোহর জেলায় তালগেড়াগ্রামে ইহার জন্ম। লোকনাথের পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন, এবং সময়ে সময়ে শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। লোকনাথও অল্পবয়সে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের সংকীর্ত্তন-আন্দোলনের সংবাদ পাইয়া তিনি সেখানে আগমন করেন। তখন চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য কাটোয়া যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর বৃন্দাবন যাইবেন ভাবিয়া লোকনাথকে অবিলম্বে তথায় যাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি অবিলম্বে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, এবং পথে তীর্থস্থান দর্শন করিয়া যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। ভূ নামক একজন বৈষ্ণব এই সময়ে তাঁহার সঙ্গী হন। দীর্ঘকাল চৈ দেবের আগমন প্রতীক্ষায় বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া তাঁহার দাক্ষিণাত্য গমনের সংবাদ পাইলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনিও দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। পথে শুনিলেন চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তখন তিনিও তথায় ফিরিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভে বার বার বিফলমনোরথ দেখিয়া লোকনাথ ভূগর্ভের সহিত বৃন্দাবনে বাস করিলেন। ক্রমে রূপ, সনাতন প্রভৃতি অনেক ভক্ত বৃন্দাবনে আসিয়া মিলিত হন। সকলের সঙ্গেই লোকনাথের বন্ধুত্ব হইল। বিশেষতঃ ভূগর্ভের সহিত তাঁহার গাঢ় আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। লোকনাথ দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া ভক্তিধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। লিখিত আছে, তিনি তথায় রাধাবিনোদের

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রূপ সনাতনের পরলোক গমনের পরেও তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ব্যাকুলাত্মা যুবক নরোত্তম তাঁহার অনেক সেবা করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া লোকনাথ নরোত্তমকে মন্ত্র দীক্ষা দেন।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নেতা রূপ-সনাতন। তাঁহারা তিন ভাই; রূপ, সনাতন ও বল্লভ। জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা প্রথম বয়সে গৌড়ের নবাব সৈয়দহুসেন সাহের উজীর ছিলেন। তখন তাঁহাদের নাম ছিল, সাকর মল্লিক ও দবীর খাস। ইঁহাদের জীবনকাহিনী গভীর রহস্যময়। উভয়েই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত [illegible] উত্তরকালে তাঁহারা পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন এবং গোঁসাই [illegible]মী, অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। [illegible] বয়সে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। [illegible]তাঁহারা বার বার আপনাদিগকে নীচ জাতি, অধম বলিয়া [illegible]য়াছিলেন। তাঁহারা যখন চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ [illegible]জন্য নীলাচলে গমন করেন, তখন নগরের বাহিরে যবন [illegible] সহিত তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মনে [illegible]া যবন দোষে দূষিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মুসলমানধর্ম্ম [illegible] আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। [illegible] পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উত্তরকালে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ এই কথা গোপন করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে কর্ণাটদেশীয় হিন্দু-রাজবংশজাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অসম্ভব নয়। মনে হয় কোন কারণে তাঁহারা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপ-সনাতনের পিতা পরমসাত্ত্বিক ছিলেন। যবন স্পর্শের ভয়ে নৈহাটী ছাড়িয়া চন্দ্রদ্বীপে যান। পুত্রগণ কি করিয়া যবনসেবায় জীবন

অর্পণ করেন তাহা বলা যায় না। রাজকার্য্যে তাঁহাদের দক্ষতা ও সুযশ ছিল।

চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবন গমনের উদ্দেশ্যে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলী গ্রামে আগমন করেন সেই সময়ে তাঁহার সহিত রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ হয়। যেমন বিদ্যানগরে রামানন্দ রায় চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া রাজকার্য্য ত্যাগের সঙ্কল্প করেন, এখানেও তাহাই হইল। লৌহ যেমন চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ প্রথম সাক্ষাতেই সাকর মল্লিক ও দবীর খাস চৈতন্যদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এই খানেই চৈতন্যদেবের মহত্ত্ব, এবং রূপ সনাতনের বিশেষত্ব। জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসে এ প্রকার হৃদয়-পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত কমই আছে। চৈতন্যদেব কয়েকদিন মাত্র রামকেলি ছিলেন। সাকর মল্লিক ও দবীর খাস প্রকাশ্যে তাঁহার সহিত সা[illegible] করিতেন না; রাত্রিতে গোপনে তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। ইহারই প্রভাবে গৌড়ের বাদসাহের উজীরী পরিত্যাগ করিয়া ভাই ফকিরী গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। মানব ইতিহাসে এ[illegible] বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

রামকেলী পরিত্যাগকালে চৈতন্যদেব দবীর খাস ও সাক[র] মল্লিককে বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য উপদেশ দেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি তিন ভাইয়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রূপ, সনাতন ও বল্লভ নাম রাখেন। তাঁহারাও অচিরে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রূপ ও বল্লভ আপনাদের অতুল বিষয় সম্পত্তির অধিকাংশ লইয়া নৌকাযোগে চন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন। তাঁহারা আর গৌড়ে ফিরিলেন না। বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া বৃন্দাবন

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে প্রয়াগে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন বৃন্দাবন দর্শন করিয়া নীলাচল প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। কয়েকদিন ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া উভয়কে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন। রূপ তাঁহার সঙ্গে নীলাচল যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন "এখন বৃন্দাবন যাও। পরে আসিয়া নীলাচলে আমার সহিত মিলিত হইবে।" রূপ ও বল্লভ তদনুসারে বৃন্দাবন গমন করিলেন। এখন হইতে বৃন্দাবনই তাঁহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইল। সনাতনের আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। রাজকার্য্যের শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে তাঁহাকে [illegible] বেগ পাইতে হইয়াছিল। নবাব রূপের প্রস্থানে এবং সনাতনের রাজকার্য্যে অমনোযোগে তাঁহাদের অভিসন্ধি বিষয়ে সন্দিহান [illegible]াছিলেন। বাস্তবিক সনাতন বৃন্দাবনে পলাইবার সুযোগ [illegible]তেছিলেন। অসুস্থতার ভাণ করিয়া তিনি দরবারে যাইতে-[illegible]লেন না। নবাব তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজ-বৈদ্যকে প্রেরণ [illegible]রেন। তিনি গিয়া বলিলেন, "অসুখ কিছু দেখিলাম না।" কোন [illegible]বাদ না দিয়া একদিন নবাব স্বয়ং আসিয়া দেখিলেন সনাতন [illegible]গণকে লইয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। নবাব তাহাতে বিস্ময় [illegible]কাশ করিলে সনাতন বলিলেন, "আমার দ্বারা আর রাজকার্য্য হইবে না; আপনি অন্য মন্ত্রী দেখুন।" এই সময়ে হুসেন সাহ উৎকলের রাজার সহিত যুদ্ধে যাইতেছিলেন। তিনি সনাতনকে তাঁহার সহিত যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সনাতন তাহাতেও সম্মত হইলেন না। নবাব তখন তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়া উৎকলযুদ্ধে গমন করেন। সনাতন কারাধ্যক্ষকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া পলায়ন করেন। দরবেশের বেশ ধারণ করিয়া পার্ব্বত্য

পথে দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়া তিনি বারাণসী উপস্থিত হন। সেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে দুই মাস নিকটে রাখিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন পাঠাইয়া দেন। তৎপূর্ব্বেই রূপ ও বল্লভ নীলাচল যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন সনাতনের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

রূপ ও বল্লভ গৌড় হইয়া নীলাচল উদ্দেশ্যে বাহির হন। গৌড়ে গঙ্গাতীরে বল্লভের মৃত্যু হয়। তখন রূপ একাকী নীলাচলে আসেন। গৌড়ের বৈষ্ণবগণ তৎপূর্ব্বেই নীলাচল পৌঁছিয়াছিলেন। সেখানে সকলের সহিত রূপের মিলন হইল। বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিবার সময়ে ব্রজলীলা বিষয়ে একখানি নাটক লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পথে আসিতে আসিতে কড়চা করিয়া কিছু কিছু লিখিয়াছিলেন। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নাটকের কোন কোন অংশ দেখিয়া বহু প্রশংসা করেন। দশমাস নীলাচলে অবস্থানের পর রূপ গৌড়ের পথে বৃন্দাবন প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সনাতন ঝারিখণ্ডের বন্যপথে নীলাচল যাত্রা করেন। দুই ভাইয়ে পথে সাক্ষাৎ হইল না।

সনাতন নীলাচলে রূপের ন্যায় হরিদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিদিন তাঁহার সহিত সেখানে সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। রূপ ও সনাতনের নীলাচলে অবস্থানের বিবরণ প্রথমখণ্ডে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এখন আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম না। কেবল একটি বিষয়ে এখানে বলা আবশ্যক মনে হইতেছে, যাহাতে সনাতনের অদ্ভুত বৈরাগ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়া আসিবার সময়ে তাঁহাকে বন্য ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার

চর্ম্মরোগ হয়। তিনি যখন নীলাচল পৌছেন তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত। তাহা হইতে রস ও পুঁজ বাহির হইত। তাহা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। ইহাতে সনাতন দুঃখিত হইয়া রথ-যাত্রার দিন রথচক্রের নিম্নে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন মনে করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাহা বুঝিতে পারিয়া বলেন, "দেহত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হয় না। কিন্তু সুপথে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ ও মানবের সেবা করিলে ভক্তি লাভ হয়।" শ্রীচৈতন্য আরও বলেন যে "তোমার এই দেহ তুমি আমাকে সমর্পণ করিয়াছ, ইহা নষ্ট করিবার অধিকার তোমার নাই। ইহার দ্বারা আমি অনেক কার্য্য সংসাধিত করিব।" তাঁহার বাক্যে সনাতন দেহত্যাগের বাসনা পরিত্যাগ করেন।

প্রায় এক বৎসর কাল সনাতনকে নীলাচলে রাখিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। প্রতিদিন উপলভোগের পরে হরিদাসের দ্বারে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন, এবং দীর্ঘ সময় গভীর-ভাবে ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতেন। রূপ ও সনাতনের দ্বারা বৃন্দাবনে যে মহৎ সাধন করিবেন চৈতন্যদেব পূর্ব্ব হইতেই তাহা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাকে দীর্ঘকাল নিকটে রাখিয়া স্বয়ং তাঁহাদের শিক্ষা দেন; রূপের সহিত অনেক সময়ে বাক্যালাপ করিতেন; কিন্তু সনাতনের সঙ্গে বিশেষভাবে ধর্ম্মালাপ হইত।

প্রায় এক বৎসর নীলাচলবাসের পর সনাতন বৃন্দাবন ফিরিয়া আসেন। এখন হইতে বৃন্দাবন দুই ভাইয়ের স্থায়ী কর্ম্মক্ষেত্র হইল। তাঁহাদের অদ্ভুত ত্যাগ, কঠোর বৈরাগ্য, গভীর ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ও অতুলনীয় নিষ্ঠায় বৃন্দাবন ব্যাকুলাত্মাগণের পরম আকর্ষণের স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। একে একে বহু ভক্ত আসিয়া তাঁহাদের সহিত

মিলিত হইয়াছিলেন। এই সকল বৈষ্ণব-সম্মিলনে দিন দিন বৃন্দাবনের বহু উন্নতি হইতে লাগিল। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলীর পরম ভক্তিভাজন নেতা হইলেন। তাঁহারা কঠোর বৈরাগ্যে এবং গভীর ধর্ম্মসাধনে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিষয়নিস্পৃহতা ও ভক্তিভাবের জন্য জন-সাধারণ উভয়কে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে বহু ভক্তদল বৃন্দাবন আগমন করিতেন। ভক্তগণ তাঁহাদিগকে অনেক রত্ন উপহার দিতেন। কিন্তু তাহা তাঁহারা স্পর্শও করিতেন না। এই অর্থে মন্দিরনির্ম্মাণ, বিগ্রহসেবা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইত। ক্রমে বৃন্দাবনের জীর্ণ মন্দির সংস্কার ও অনেক নূতন মন্দির স্থাপিত হইল। বৃন্দাবনের শ্রীবৃদ্ধির মূলে রূপ ও সনাতন। রূপ ও সনাতন নিত্য কঠোর বৈরাগ্যে দিন যাপন করিতেন। বৃক্ষতলে শয়ন, ভিক্ষা দ্বারা উদরান্নের সংস্থান তাঁহাদের নিয়ম ছিল। বৈষ্ণবদের লইয়া শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহাদের চেষ্টায় বৃন্দাবন ভক্তিশাস্ত্র আলোচনার প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষভাবে শাস্ত্রালোচনা করিতে ভালবাসিতেন তাঁহারা বৃন্দাবনে গমন করিতেন অথবা বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ সনাতনের ন্যায় আচার্য্যগণের সংস্পর্শে নিজেরাও জ্ঞানার্জ্জনে জীবন অর্পণ করিতেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রূপ ও সনাতন তাহার পথ-প্রদর্শক। তাঁহারা উভয়েই অনেক ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের নিম্নলিখিত তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

"সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ চতুষ্টয়।

টীকাসহ ভাগবতামৃত-খণ্ডদ্বয় ॥

হরিভক্তি-বিলাসটীকা দিক্‌প্রদর্শিনী।
বৈষ্ণবতোষনী নাম দশমটিপ্পনী॥
লীলাস্তব দশমচরিত যারে কয়।
সনাতন গোস্বামির এই চতুষ্টয়।

*   *   *

"শ্রীরূপগোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।
লীলা সহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল॥
কাব্য হংসদূত আর উদ্ধব সন্দেশ।
কৃষ্ণ জন্মতিথি বিধি বিধান অশেষ॥
গণোদ্দেশ দীপিকা বৃহ—লঘুদ্বয়।
স্তবমালা বিদগ্ধ মাধব রসময়॥
ললিতমাধব বিপ্রলম্ভের অবধি।
দানলীলাকৌমুদী আনন্দমহোদধি॥
দানকেলিকৌমুদী বিদিত এই নাম।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ অনুপম॥
শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থরসপূর।
প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকাগ্রন্থ সুমধুর॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী এ বিদিত।
নাটকচন্দ্রিকা লঘুভাগবতামৃত॥"

ভক্তিরত্নাকর আদিলীলা প্রথমতরঙ্গ।

অন্যান্য বৈষ্ণবগণের ন্যায় রূপ ও সনাতনের পরলোকগমনের সময় এবং সঠিক বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের পরলোকগমনের পর দীর্ঘকাল তাঁহারা জীবিত ছিলেন না। শ্রীনিবাস

আচার্য্য যখন বৃন্দাবনে আসেন তখন তাঁহারা উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী গঠনে রূপ ও সনাতনের পরে শ্রীজীব গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি রূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের পুত্র। কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদেব যখন রামকেলী যান সেই সময়ে শ্রীজীবও তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। একথা কতদূর প্রামাণ্য বলা যায় না। হইতে পারে বাল্যকালে জীব গোস্বামী পিতা ও পিতৃব্যদের সহিত রামকেলী বাস করিতেন। তাঁহাদের রামকেলী পরিত্যাগের পর তিনি চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে বাল্যকাল হইতেই তিনি কৃষ্ণবলরামের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি লইয়া, পূজা করিতেন এবং বক্ষে ধারণ করিয়া নিদ্রা যাইতেন। এই বিবরণ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। তবে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যায়। অল্প বয়সেই তিনি ব্যাকরণ ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি নিষ্ঠার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। এই সময়ে তিনি কৃষ্ণবলরামের নামে ক্রন্দন করিতেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শ্রীজীব অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। তখনও তিনি চন্দ্রদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বিলাসদ্রব্য, সূক্ষ্ম বস্ত্র, সুখাদ্য আহার প্রভৃতি পরিত্যাগ করেন। কিছুদিন পরে পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভক্তিধর্ম্ম সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে চন্দ্রদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া ফতেয়াবাদ হইয়া তিনি নবদ্বীপ যাত্রা করেন। সেই সময়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ খড়দহ হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের দর্শন পাইয়া শ্রীজীব অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। কিছুদিন নিত্যানন্দের নিকট অবস্থানের পর তাঁহার অনুমতি লইয়া শ্রীজীব বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে বারাণসীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া মধুসূদন বাচস্পতি নামক একজন ব্রাহ্মণের নিকট বেদ অধ্যয়ন করেন। তৎপরে বৃন্দাবন আসিয়া রূপ ও সনাতনের সহিত মিলিত হন। সনাতনের বৈরাগ্য এবং রূপের কবিত্বশক্তি তাঁহাতে না থাকিলেও শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাদের উপযুক্ত বংশধর। জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের পরলোকগমনের পর তিনি বৃন্দাবনের নেতা হইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বৃন্দাবনের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া বৈষ্ণবগণের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। রূপ ও সনাতনের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে তিনি অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তি বৈষ্ণবদর্শন রচনা। তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের দার্শনিক বলিতে পারা যায়। তিনি বৈষ্ণবদর্শন বিষয়ে কয়েকটি সুবিস্তৃত সন্দর্ভ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকারে তাঁহার লিখিত পুস্তকের নিম্নলিখিত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে :—

"শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
হরিনামামৃতব্যাকরণ দিব্য রীত॥
সূত্রমালিকা ধাতুসংগ্রহ সুপ্রচার।
কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকাগ্রন্থ অতি চমৎকার॥
গোপালবিরুদাবলী রসামৃত শেষ।
শ্রীমাধবমহোৎসব সর্ব্বাংশে বিশেষ॥

শ্রীসঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ গ্রন্থ এ প্রচার।
ভাবার্থ সূচকচম্পূ অতি চমৎকার॥
গোপালতাপনী টীকা ব্রহ্মসংহিতার।
রসামৃতটীকা শ্রীউজ্জ্বলটীকা আর॥
যোগসার-স্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।
অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী ভাষ্যতথি॥
পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন।
শ্রীরাধিকাকর-পদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন॥
গোপালচম্পূ পূর্ব্ব উত্তর বিভাগেতে।
বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে॥
সপ্ত সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবতরীতি।
তত্ত্ব ভগবৎ পরমাত্ম কৃষ্ণভক্তি প্রীতি॥
এই ছয় ক্রমসন্দর্ভ সপ্ত হয়।
প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধ ইথে ত্রয়॥"

ভক্তিরত্নাকর আদিলীলা প্রথম তরঙ্গ।

গৌড় হইতে সমাগত আর একজন বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলীর ইতিহাস চির গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তিনি রঘুনাথ দাস। ইঁহার পিতা গোবর্দ্ধন দাস নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী সপ্তগ্রামের জমিদার। গৌড়ের নবাবকে বার লক্ষ মুদ্রা রাজকর প্রদান করিতেন, এবং বিশ লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব আদায় হইত। রঘুনাথ দাস এই অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু বিষয়সুখ তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। অল্প বয়সেই ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য হিরণ্যদাস নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ধন সম্পত্তি দান করিতেন।

"হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার, সৎকুলীন, ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥"

ভক্তিরত্নাকর, মধ্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর নিকট তাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন। দুই ভ্রাতাই তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। বালক রঘুনাথ তাঁহাদের নিকট হইতে নবদ্বীপের সংবাদ পাইতেন। শ্রীচৈতন্য-দেব সন্ন্যাস গ্রহণান্তর যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করেন সেই সময়ে রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিতে শান্তিপুর আসেন। রঘুনাথের পিতা অদ্বৈতাচার্য্যের বন্ধু ছিলেন। আচার্য্য রঘুনাথকে পরমসমাদরে স্বগৃহে রাখেন। চৈতন্যদেবও তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করেন। কয়েকদিন নিকটে রাখিয়া নীলাচল গমন-কালে রঘুনাথকে নিজগৃহে প্রেরণ করেন। এখন হইতেই রঘুনাথ দাস গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হন। পিতামাতা তাঁহার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া প্রহরী দ্বারা তাঁহার রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

"পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি দিনে।
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে॥
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥"

ভক্তিরত্নাকর, মধ্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ

প্রহরীদিগের বেষ্টন এড়াইয়া পলাইবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া রঘুনাথ দাস নিরাশ হইয়া পড়েন। অবশেষে চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন করিয়া অদ্বৈতের গৃহে যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন রঘুনাথ দাস পিতার অনুমতি লইয়া পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পান। এবার তিনি তাঁহাকে আপনার মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা ও পিতামাতার প্রতিবন্ধকতার কথা জানাইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বাহিরের বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। হৃদয়ের ভাব গোপন রাখিয়া স্বাভাবিক ভাবে বিষয় কর্ম্ম করিতে বলেন। যথাসময়ে গৃহে আসিয়া রঘুনাথ দাস তাহাই করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া পিতামাতা সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইলেন। পাহারার কড়াকড়ি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। সেই সুযোগে রঘুনাথ দাস আর একবার গৃহ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এবারও পথে ধরা পড়িয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইল। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার জননী পুত্রকে ভালরূপে প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত রাখিবার জন্য স্বামীকে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি বলেন এত গৃহ সুখ এবং ঐশ্বর্য্য যাহাকে বাঁধিতে পারিল না, বাহিরের বন্ধনে তাহার কি হইবে?

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এসব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিব কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥"

ভক্তিরত্নাকর, অন্তলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু গোবর্দ্ধন দাস তথাপি পুত্রকে প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। রঘুনাথ দাসকে আরও কিছু দিন গৃহে বদ্ধ হইয়া থাকিতে

হইল, এই সময়ে রঘুনাথ দাস পিতার অনুমতি লইয়া পানিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে অতিশয় প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গী বৈষ্ণবদলকে মহোৎসব দিবার অনুমতি করেন। তদনুসারে রঘুনাথ দাস মহোৎসব করেন। নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণবগণকে শতমুদ্রা ও দুই তোলা সোণা উপহার প্রদান করেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে অচিরে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার মিলন হইবে।

পানিহাটী হইতে গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ দাস পূর্ব্বের ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অন্তরে গভীর ব্যাকুলতা কিন্তু বাহিরে ধীর ভাব। তাঁহার পিতা তথাপি তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা প্রহরী রাখিতেন। একদিন শেষ রাত্রিতে প্রহরীগণ নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, সুযোগ বুঝিয়া রঘুনাথ দাস গৃহ পরিত্যাগ করেন। এবার তিনি ধৃত হইবার ভয়ে রাজপথ ছাড়িয়া বনপথে উড়িষ্যার দিকে চলিলেন। প্রভাতে উঠিয়া গোবর্দ্ধন দাস পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করেন। তাহারা রাজপথে খুঁজিয়া রঘুনাথ দাসকে দেখিতে পাইল না। এই সময়ে গৌড়ে বৈষ্ণবগণ নিয়মিত প্রথা অনুসারে নীলাচল যাইতেছিলেন। গোবর্দ্ধন দাস তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কিন্তু সে দলেও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তিনি বন্যপথে দ্রুতবেগে নীলাচল অভিমুখে যাইতেছিলেন। প্রথম দিন পনর ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে গোয়ালাদের একটি বাথানে উপস্থিত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে উপবাসী দেখিয়া কিছু দুগ্ধ পান করিতে দেয়। দিনান্তে তাহা পান করিয়া রঘুনাথ দাস এক পার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া

পড়িলেন। এইরূপে বার দিনে তিনি নীলাচলে পৌঁছিলেন। তন্মধ্যে তিন দিন মাত্র আহার করিতে পাইয়াছিলেন। বার দিন পরে নীলাচলে পৌঁছিয়া যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে বসিয়াছিলেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। পথশ্রমে তাঁহাকে ক্লিষ্ট দেখিয়া শীঘ্র তাঁহাকে স্নান করাইয়া আহারের ব্যবস্থা করিতে ভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ দিলেন।

রঘুনাথ দাস এখন হইতে নীলাচলে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদরের হস্তে বিশেষভাবে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। অতুল ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী রঘুনাথ দাস এখন হইতে যে বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিলেন তাহা চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তিনি পাঁচদিন মাত্র গোবিন্দের নিকট হইতে চৈতন্যদেবের প্রসাদান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে সারাদিনের পর সন্ধ্যাকালে মন্দির দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহার দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন।

"পরম বৈরাগ্য তাঁর নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করয়ে চর্ব্বণ॥"

ভক্তিরত্নাকর, অন্ত পর্ব্ব, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে ইহাও পরিত্যাগ করিয়া কঠোরতর বৈরাগ্যের অন্ন ছত্রে ভিক্ষা মাগিয়া জীবন রক্ষা করিতেন। তৎপরে তাহাও

ছাড়িয়া অবিক্রীত পরমান্ন সিংহদ্বারে গাভীগণের আহারের জন্য যাহা ফেলিয়া দেওয়া হইত তাহাই কুড়াইয়া লইয়া, পচা অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট জলে ধৌত করিয়া ভক্ষণ করিতেন।

"প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়।
সিংহদ্বারে সেই ভাত গাভী আগে ডারে।
সড়া গন্ধে তেলেঙ্গা গাভী খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পাণি॥
ভিতরের দড় ভাত মাজি যেই পায়।
লুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥

ভক্তিরত্নাকর, অষ্টম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে রঘুনাথ দাস নীলাচলে থাকিয়া দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও স্বরূপ দামোদরের পরলোকগমনের পর তিনি বৃন্দাবন যান। সেখানে রূপ সনাতন, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মসাধন ও ভক্তিশাস্ত্রচর্চ্চায় দিন অতিবাহিত করেন। এখানেও তিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে আর একজন প্রধান ব্যক্তি গোপাল ভট্ট। ইনি দ্রাবিড় (বর্ত্তমান তামিল) দেশবাসী। ইঁহার পিতার নাম বেঙ্কট ভট্ট। শ্রীচৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনে গিয়াছিলেন সেই সময়ে শ্রীরঙ্গপট্টমে ইঁহাদের গৃহে তিনি চারি মাস অতিথি ছিলেন। বেঙ্কট ভট্ট শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। শ্রীরঙ্গপট্টমের মন্দিরে চৈতন্যদেবের নর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তন দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরম ভক্তি

সহকারে তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করেন। তিনি সেই চারিমাসকাল সপরিবারে তাঁহার অনেক সেবা করেন। গোপাল ভট্টের বয়স তখন অল্প। চৈতন্যদেবের মহত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও মনে হয় এই অভিনব সন্ন্যাসী তাঁহার হৃদয়ে একটি গভীর ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। পিতামাতার পরলোকগমনের পর—সুদীর্ঘ আঠার বৎসর কালের ব্যবধানে—গোপাল ভট্ট শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব দলে মিলিত হইবার জন্য বৃন্দাবন গমন করেন। কথিত আছে তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গেই যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বালক গোপালকে নিষেধ করিয়া আপাততঃ পিতামাতার সেবা করিতে বলেন। পরে বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দেন। বহু বৎসর পরে গোপাল ভট্টের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। কিন্তু চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। পথে নীলাচলে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ না করার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। বৃন্দাবনে আসিয়া গোপাল ভট্ট, রূপ ও সনাতন এবং তাঁহার পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সাক্ষাৎ পাইলেন। এখন হইতে বৃন্দাবনেই তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তথাকার বৈষ্ণবমণ্ডলীতে গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ ভক্তির জন্য শীঘ্রই তিনি উচ্চস্থান লাভ করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার আগমন বার্ত্তা পাইয়া তাঁহাকে নিজ আসন এবং কৌপিন ও বহির্বাস উপহার প্রেরণ করেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ গোপাল ভট্টের প্রতি শ্রীচৈতন্যের এই অসামান্য কৃপা দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতে লাগিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই চৈতন্যদেব পরলোক গমন করেন। গোপাল ভট্ট দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধন এবং বৈষ্ণবমণ্ডলীর সেবা করিয়াছিলেন। 'হরিভক্তি বিলাস' নামে তিনি একখানি পুস্তক রচনা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব

শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই শ্রীনিবাস আচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতা হইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলীর ছয়জন প্রধান নেতা। তাঁহারা গোঁসাই বা গোস্বামী নামে অভিহিত হইতেন।

"রূপ সনাতন আর ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥"

রঘুনাথ ভট্টের পূর্ব্বনিবাস বারাণসী। চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন সময়ে দুই মাস কাশীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি রঘুনাথ ভট্টের পিতা তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। রঘুনাথ ভট্ট তখন বালক। গোপাল ভট্টের ন্যায় বালক রঘুনাথের জীবনেও চৈতন্য চরিত্রের ছাপ পড়িয়াছিল। তিনি প্রতিদিন তাঁহার উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন ও পাদসম্বাহন করিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রঘুনাথ ভট্ট নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিকট গমন করেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। রঘুনাথ ভট্ট তখন যুবক। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করেন, এবং আপাততঃ বারাণসীতে ফিরিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে রঘুনাথ বারাণসী ফিরিয়া পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। চারি বৎসর পরে পিতামাতার মৃত্যু হইলে তিনি পুনর্ব্বার নীলাচল আসেন। এবারেও তিনি আট মাস শ্রীচৈতন্যের নিকটে ছিলেন। তিনি ভাগবতে সুপণ্ডিত। কণ্ঠস্বরও অতি মধুর।

"পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে॥"

চৈঃ চঃ, অঃ লী, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যদেব তাঁহাকে আট মাস নিজের নিকট রাখিয়া পরে বৃন্দাবন এবং তথাকার বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ভাগবত পাঠ করিতে আদেশ করেন। রঘুনাথ ভট্ট তথাকার মণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন। বিশেষভাবে রূপ গোস্বামীর সহিত তাঁহার যোগ হইয়াছিল। প্রতিদিন তাঁহাকে ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

বৃন্দাবনের মণ্ডলীর আর একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইঁহার জন্মস্থান বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে। বাল্যকালেই ইনি পিতৃমাতৃহীন হন। কৃষ্ণদাসের পিতৃ-স্বসা পিতৃ-মাতৃহীন বালককে পালন করেন। ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহার প্রথম জীবন কাটে। অল্প বয়সেই তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ হয়। প্রথম যৌবনে তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন আগমন করেন এবং আমরণ সেখানে বাস করেন। এত অল্প বয়সে তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করেন এবং এত দীর্ঘকাল তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়াছিলেন যে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বাংলা ভাষা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অমরগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা নির্দ্দোষ নয়। তাহাতে অনেক ব্রজবুলি মিশ্রিত আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃদ্ধ বয়সে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সে সময়ের অবস্থা স্বীয় গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির॥

নানারোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগে ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি ॥"
চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ অমর এবং ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের গভীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই সকল পূতচরিত্র সাধু ও ভক্ত বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলীকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে বৃন্দাবনের মণ্ডলীর স্থান অতি উচ্চে। গভীর জ্ঞানালোচনা, উচ্চাঙ্গের সাধন, চরিত্রের গরিমা, আশ্চর্য্য বৈরাগ্যে বৃন্দাবনের মণ্ডলী বৈষ্ণবইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসার।

নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য প্রমুখ নেতৃগণের সময়ে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পূর্ণ জোয়ার প্রবাহিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মৃত্যুর পরে অল্প দিনের জন্য বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের বেগ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অপর দুইজন শক্তিশালী নেতার অভ্যুদয় হয়। তাঁহাদের নাম শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম দাস। তাঁহাদের নেতৃত্বে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। পরে তাঁহাদের বিস্তৃত জীবনী প্রদত্ত হইবে। এখানে তাঁহাদের কার্য্যের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। শ্রীনিবাস ও নরোত্তম দাসের সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম উত্তরবঙ্গে প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ও রাজসাহী জেলায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নরোত্তমের জন্মস্থান পদ্মাতীরে খেতরি গ্রামে। তিনি ধনীর সন্তান। খেতরির জমীদার রাজা কৃষ্ণানন্দ রায় তাঁহার পিতা। কিন্তু অল্প বয়সে নরোত্তমের জীবনে অসাধারণ বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। তিনি পিতৃসম্পদে আসক্ত না হইয়া চিরজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন করতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধনে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার আগ্রহ ও চেষ্টায় খেতরি গ্রামে একটি বৈষ্ণবমণ্ডলী গঠিত হয়। ক্রমে খেতরি বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র হইয়াছিল। একমাত্র সন্তানের সংসার ত্যাগে তাঁহার পিতা ব্যথিত [illegible] ও রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্রের ধর্ম্মসাধনে বাধা দেন নাই। বরং [illegible] ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষদত্ত নরোত্তমের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিপুল

ধনসম্পত্তি নরোত্তমের ইচ্ছানুসারে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অকাতরে ব্যয়িত হইয়াছিল। নরোত্তম খেতরি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের একটি বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু ব্যয়ে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়; এতদুপলক্ষে খেতরিতে মহামহোৎসব হইয়াছিল। সেই সময়ে গৌড়দেশের বৈষ্ণবগণের যে সম্মিলনী হইয়াছিল বঙ্গদেশের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। সন্তোষদত্ত নবপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের রক্ষা ও পূজার স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। এখনও সে মন্দির ও বিগ্রহ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এখন তাহার আর সে অবস্থা নাই। কালক্রমে খেতরির বৈষ্ণবমণ্ডলী লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তবে এখনও খেতরি গ্রামে প্রতি বৎসর একটি মেলা হয়। তদুপলক্ষে নানাস্থানের বৈষ্ণবগণ তথায় মিলিত হন। নরোত্তমের জীবন ও কার্য্যের প্রভাবে খেতরি বৈষ্ণবগণের একটি চিরস্মরণীয় তীর্থ হইয়াছে।

এই সময়েই খেতরির অনতিদূরে যাজগ্রামে আর একটি বৈষ্ণবমণ্ডলী গড়িয়া উঠে। নরোত্তমের বন্ধু শ্রীনিবাস আচার্য্য ইহার মূলে ছিলেন। এই যুগে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম দাস বিপুল উৎসাহে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আন্তরিক সৌহৃদ্য থাকিলেও তাঁহাদের চরিত্রে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। নরোত্তম ভক্তি-প্রধান, শ্রীনিবাস আচার্য্য জ্ঞানপ্রধান। নরোত্তম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রালোচনার দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন। প্রথম বয়সে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন গমন করেন। তাহার অল্পদিন পরে নরোত্তমও বৃন্দাবন যান। সেখানে তাঁহাদের মিলন ও জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বৃন্দাবন হইতে তাঁহারা একত্র গৌড়ে প্রত্যাগমন করেন। আসিবার সময় বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ গৌড়ে প্রচারের জন্য তাঁহাদের সঙ্গে

অনেক ভক্তি গ্রন্থ প্রেরণ করেন। পথে সে গুলি চুরি হয়। সৌভাগ্য-ক্রমে অপহৃত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার হয়। সে কৌতূহলজনক কাহিনী অন্যত্র বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। শ্রীনিবাসাচার্য্য যথাসময়ে অপহৃত ভক্তিগ্রন্থ লইয়া যাজগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হন। এবং সেখানে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপনায় দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেন। নানাস্থান হইতে জ্ঞানপিপাসু ব্যাকুলাত্মা বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আগমন করিতেন। এইরূপে যাজগ্রাম বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগে শ্রীনিবাস আচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতা ছিলেন। বহুসংখ্যক বৈষ্ণব তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খেতরির অপর পারে পদ্মাতীরে তেলিয়াবুধরি গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আর একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ এখানে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস কুমারনগর। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। চিরঞ্জীব শ্রীখণ্ডের দামোদর সেনের একমাত্র কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে বাস করেন। দামোদর সেন শক্তি-উপাসক ছিলেন। কিন্তু চিরঞ্জীব সেন বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডনিবাসী যে সকল বৈষ্ণব চৈতন্যদেবকে দর্শন করিবার জন্য বৎসর বৎসর নীলাচল যাইতেন তাঁহাদের মধ্যে চিরঞ্জীব সেনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি চৈতন্যদেবের অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। দামোদর সেনের মৃত্যুর পর চিরঞ্জীব শ্রীখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে পূর্ব্বনিবাস কুমারনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উত্তরকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কুমারনগর পরিত্যাগ করিয়া বুধরি গ্রামে বাস করেন। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ উভয়েই সুকবি ও

শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। গৌরাঙ্গভক্ত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র হইলেও প্রথম বয়সে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ দেখা যায় না। যৌবনে শ্রীনিবাসাচার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া রামচন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তাঁহার নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। এখন হইতে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের বিশেষ প্রিয় এবং প্রধান শিষ্যরূপে পরিগণিত হন। পূর্ব্বেই রামচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। দীক্ষার পরে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহাতে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গোবিন্দ আরও অধিক বয়সে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মাতামহের প্রভাবে তিনি অনুরাগী শক্তি-উপাসক ছিলেন। কথিত আছে একবার গ্রহণীরোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে দেবী ভগবতী স্বপ্নে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে গোবিন্দ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর হইতেই রোগের উপশম হয়। রামচন্দ্রের ন্যায় গোবিন্দও বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগী ভক্ত হইয়াছিলেন। উভয়েই সুপণ্ডিত এবং সুকবি। তাঁহাদের রচিত অনেক পদাবলী আছে। গোবিন্দের পদাবলী বিশেষ প্রসিদ্ধ। উভয়েই কবিরাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ও গোবিন্দের অবস্থানে বুধরি বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। খেতরী যাইতে বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই বুধরিতে কিছু সময় অতিবাহিত করিতেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং নরোত্তম দাস এখানে আসিয়া বাস করিতেন।

এই অঞ্চলের আর একটি বৈষ্ণব-কেন্দ্র কাঞ্চনগড়িয়া। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু হরিদাস আচার্য্যের দুই পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ এখানে

বাস করিতেন। বোধ হয় হরিদাস আচার্য্যেরও এখানে বাসস্থান ছিল। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে হরিদাস আচার্য্য বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। উত্তরকালে সেখানে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হরিদাস আচার্য্য শ্রীনিবাসকে স্বীয় পুত্রদ্বয়কে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। গৌড়ে প্রত্যাগমনের পর শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বিজহরিদাসের পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে হরিদাস বৃন্দাবন গমনের পূর্ব্বেই স্বীয় পুত্রদিগকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীদাস ও গোকুলানন্দকে বলিলেন "আগামী মাঘী কৃষ্ণা একাদশী তোমাদের পিতৃদেবের পরলোকগমনের সাম্বৎসরিক। সেই দিন কাঞ্চনগড়িয়ায় মহোৎসবের আয়োজন কর। ঐ সময়ে তোমাদেরও দীক্ষা হইবে।" শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে মহোৎসবের আয়োজন হইল। নানা স্থান হইতে বহু সংখ্যক মহান্ত ও বৈষ্ণব এই উৎসবে যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে তাঁহার নিকটে গভীর ভাবে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখন হইতে দুই ভ্রাতা কাঞ্চনগড়িয়ায় থাকিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় কাঞ্চনগড়িয়া এবং নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে এই অঞ্চলের নানা স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এই প্রদেশে এখনও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী বনবিষ্ণুপুরেও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রসার

লাভ করে। বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার অতীব বিস্ময়জনক ব্যাপার। সে সময়ে বনবিষ্ণুপুরে বীরহাম্বির নামে একজন রাজা বা বড় জমিদার বাস করিতেন। রাজা হইলেও তিনি দস্যুবৃত্তি করিতেন। তাঁহার অধীনে অনেক দস্যু ছিল। তাহাদের দ্বারা বীরহাম্বির পথিকদের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিতেন। বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিবার সময় শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভক্তিগ্রন্থ অপহৃত হয়। এই গ্রন্থাপহরণ রাজা বীরহাম্বিরের কার্য্য। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বহু প্রহরী পরিবেষ্টিত শকটে কাষ্ঠসম্পুট লইয়া যাইতেছেন শুনিয়া বীরহাম্বির মনে করিলেন কোন বণিক ধন রত্নাদি লইয়া যাইতেছে; এবং সুযোগ বুঝিয়া দস্যুদিগকে তাহা অপহরণ করিতে আদেশ করিলেন। বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকটে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি একদিন রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তাঁহারা গভীর নিদ্রাভিভূত হইলেন। দস্যুগণ উপযুক্ত সময় দেখিয়া সম্পুটসহ শকট লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল। রাজা বীরহাম্বীর সম্পুট খুলিয়া দেখিলেন যে তাহাতে ধনরত্ন নাই; তদপরিবর্ত্তে স্তরে স্তরে পুস্তক সাজান আছে। রাজা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। দস্যু-নেতা [illegible]লেও তিনি নিতান্ত অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ দেখা যায় তাঁহার সভায় নিয়মিতরূপে ভাগবত পাঠ হইত। তিনি বুঝিতে পারিলেন কোনও জ্ঞানী লোক শকটে করিয়া এই পুস্তকগুলি লইয়া যাইতেছেন। সন্ধান পাইলে তাঁহাকে সেগুলি প্রত্যর্পণ করিবেন স্থির করিলেন। তদনুসারে গ্রন্থগুলি সযত্নে রক্ষার জন্য আদেশ দিলেন। বৈষ্ণবগণ বলেন গ্রন্থদর্শন ও স্পর্শে রাজার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়। সেরূপ অনুমান না করিলেও চলিতে পারে।

এদিকে প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে শ্রীনিবাসপ্রমুখ ভক্তগণ শকট না

দেখিয়া বিস্মিত ও চিন্তাকুল হইলেন। অনেক চিন্তার পর শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে গৌড়ের পথে অগ্রসর হইতে বলিয়া স্বয়ং গ্রন্থান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তিনি বিষ্ণুপুরে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে কৃষ্ণবল্লভ নামক একজন ব্রাহ্মণকুমারের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, এবং তদীয় আগ্রহে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবল্লভের নিকটে শ্রীনিবাস রাজার বিবরণ পাইলেন। রাজসভায় প্রতিদিন ভাগবত পাঠ হয়, শুনিয়া শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভের সহিত ভাগবত শ্রবণের জন্য তথায় গমন করেন। রাজা বীরহাম্বির আচার্য্যের গম্ভীর জ্যোতিপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন শ্রীনিবাস স্বীয় পরিচয় এবং গ্রন্থচুরির বিবরণ দিলেন। রাজা অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া আচার্য্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শ্রীনিবাস গ্রন্থরত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রাসাদে থাকিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতে ও ভাগবত পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। আচার্য্যের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া বীরহাম্বির ও তাঁহার সভাসদগণ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। এখন হইতে রাজা বীরহাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরম ভক্ত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ভক্তিধর্ম্মে অনুরাগ ছিল বলিয়া মনে হয়। নতুবা নিত্য ভাগবত শ্রবণ করিবেন কেন? পরমভক্ত শ্রীনিবাসের সংস্পর্শে তাঁহার ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি শ্রীনিবাসকে কিছুদিন বিষ্ণুপুরে থাকিয়া ভাগবত পাঠ ও ধর্ম্মোপদেশ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। আচার্য্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শ্রীনিবাস নিত্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখা করেন। নগরবাসী বহু সংখ্যক লোক তাহা শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইতেন। বিশেষতঃ রাজা বীরহাম্বিরের জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন

হইল। কিছুদিন পরে বীরহাম্বিরমহিষী ও কুমার ধাড়ীহাম্বিরের সহিত আচার্য্যের নিকটে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ, করেন। ব্রাহ্মণ-কুমার কৃষ্ণবল্লভ ও রাজপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি অনেকে ক্রমে আচার্য্যের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এখন হইতে বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র হইয়া উঠিল। রাজা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য রাজ-কোষের অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। কিছুকাল বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিয়া আচার্য্য শ্রীনিবাস ভক্তিগ্রন্থ লইয়া যাজগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। গমনকালে রাজা অনেক দীনতা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বিষ্ণুপুর আসিতে অনুরোধ করেন। উত্তরকালে শ্রীনিবাসাচার্য্য একাধিকবার বিষ্ণুপুরে আসেন। রাজা বীরহাম্বির তাঁহার বাসের জন্য একখানি পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং অনেক ভূ-সম্পত্তি দান করেন। একবার তিনি স্বয়ং যাজগ্রামে গিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত তাঁহার গভীর যোগ স্থাপিত হয় এবং বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারে বৈষ্ণবধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে এই অঞ্চলেও বৈষ্ণবধর্ম্ম বহু প্রসার লাভ করিয়াছিল।

একদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমে যেমন দেশে ব্যাপ্ত হইতেছিল তেমনি ইহাতে অনেক আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনও আসিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা জাতিভেদ প্রভৃতি অনিষ্টকর প্রথা বর্জ্জন। শ্রীচৈতন্যদেবের মূল শিক্ষার মধ্যেই এই সংস্কারের বীজ নিহিত ছিল। মানবাত্মার মহত্ত্ব তিনি ঘোষিত করিয়া জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতার মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন।

চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ॥

এই শিক্ষায় জাতিভেদের মস্তকে কুঠারাঘাত করা হইল। চৈতন্যদেব

অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের তিনজন নেতাই হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ প্রথার মূলতঃ বিরোধী ছিলেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের প্রতি তাঁহাদের সকলেরই গভীর সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্য্যকে যখন বর দিতে চান তখন অশীতিপর বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য এই বর চাহিয়াছিলেন যেন আচণ্ডালে প্রেম দান করা হয়।

নিত্যানন্দের সকল কার্য্যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখিতে পাওয়া যায়। আহারে বসিয়া চারিদিকে উচ্ছিষ্ট ছড়াইয়া দিতেন। তথাপি শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় জাতিভেদ প্রথা বৈষ্ণবমণ্ডলী হইতে দূরীভূত হয় নাই। তবে তিনি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে স্বীয় আধ্যাত্মিক মণ্ডলীতে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যবন হরিদাসকে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সম্মানিত স্থান দিয়াছিলেন। দবীরখাস ও সাকর মল্লিককে গোস্বামী পদ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক ভাবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পৃথক স্থানে তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইত। বৈষ্ণবমণ্ডলী কখনও এই দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারে নাই। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে চৈতন্যদেব ও তাঁহার সহচরগণের শিক্ষায় জাতিভেদ সঙ্কীর্ণতা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে এমন একটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল যাহা হইতে জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত হইয়াছিল, এই সম্প্রদায়ে জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককে গ্রহণ করা হইত। তাহাদের মধ্যে অবাধে আহার বিহার বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। এই সংস্কার কোন সময়ে কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন

শ্রীপাদ নিত্যানন্দই এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হিন্দুসমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অনেক সামাজিক অবস্থার বহু উন্নতি করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণের মূলে নিত্যানন্দের শিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। আর একটি প্রবাদ এই যে তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে এই সংস্কার আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহা অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল জানিতে না পারিলেও জাতিভেদ প্রথা যে একদল বৈষ্ণবের মধ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। এই সম্প্রদায় এখনও বর্ত্তমান আছে এবং বঙ্গদেশের নানাস্থানে বহুসংখ্যক ভেকধারী বৈষ্ণব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা জাতিভেদ মানেন না। সকল জাতির লোককে অবাধে নিজ সম্প্রদায়ে গ্রহণ করেন। এখন তাঁহাদের অবস্থা হীন হইলেও এক সময়ে তাঁহারা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় কোন ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিলে জিজ্ঞাসা করা হইত আপনি কোন কুল পবিত্র করিয়াছেন অর্থাৎ যে জাতিতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বৈষ্ণব হওয়াতে সেই জাতি পবিত্র হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ বৈষ্ণবগণের অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অবস্থাও ম্লান হইয়াছে। ভেকধারী বৈষ্ণবগ[ণ] এখন জনসাধারণের অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছে। নৈতিক দুর্নীতি ইহা[র] প্রধান করাণ। আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ না করি[য়া] সামাজিক সুবিধা লাভের জন্য পরবর্ত্তীকালে লোক ভেকধারী বৈষ্ণ[ব] হইত। এখন অনেকে কোন কারণে সমাজচ্যুত হইলে ভেকধা[রী]

বৈষ্ণবদলে যোগদান করে। স্খলিতপদ নরনারীকে আশ্রয় দিয়া এই সম্প্রদায় উদারতার পরিচয় দেয়; কিন্তু তাহাদের যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনের ব্যবস্থা নাই, নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া একত্র মিলিত হয়; কিন্তু তাহারা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয় না। তথাপি ভেকধারী বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনেক সামাজিক সংস্কার করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে হিন্দুসমাজের সামাজিক জটিলতা নাই। জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনেক সরলতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে অযথা ক্রিয়া ও ব্যয় বাহুল্য নাই। ব্রাহ্মণেরও অত্যাচার নাই। অল্প ব্যয়ে এই সকল সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ে বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই প্রকারে দিনে দিনে বহু প্রসার ও উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। কেন যে সেই স্রোত বন্ধ হইয়া গেল তাহা গভীর চিন্তা ও ক্ষোভের বিষয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর অবসাদে সমগ্র বঙ্গদেশের অধোগতি হইয়াছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য।

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সমসাময়িক ভক্তগণের পরে যে সকল সাধু ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রধান। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ, শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাগীরথী তীরবর্ত্তী চাখন্দি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সম্ভবতঃ বয়সে কিঞ্চিৎ জ্যেষ্ঠ হইবেন। কাটোয়া নগরীতে যেদিন শ্রীচৈতন্য-দেব কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন সেদিন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনা, তাঁহার জীবনে গভীর পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। গৌরবর্ণ সুন্দর যুবক অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন দেখিয়া গঙ্গাধর গভীর দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্যের চাঁচরচুলে নাপিত ক্ষুর দিল দেখিয়া গঙ্গাধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বেই গঙ্গাধর লোকমুখে শ্রীচৈতন্যের কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শনের জন্য তিনি নবদ্বীপ যাইতেছিলেন পথিমধ্যে কাটোয়ায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে গঙ্গাধর পাগলের ন্যায় "চৈতন্য" "চৈতন্য" বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে স্বগ্রাম চাখন্দিতে ফিরিয়া আসিলেন। লোকে প্রথমে মনে করিল গঙ্গাধর পাগল হইয়াছেন। পরে সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত জানিয়া বিদ্রূপ করিয়া চৈতন্যদাস নাম দিল। গঙ্গাধর আপনাকে এই নামে গৌরবান্বিত মনে করিলেন এবং নিজেও আপনাকে চৈতন্যদাস নামে

পরিচয় দিতেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে চৈতন্যদাস নামেই পরিচিত হইয়াছেন। এই সময় হইতে তিনি একজন চৈতন্যের পরম ভক্ত হইলেন। কয়েক বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যদেবকে পুনর্ব্বার দর্শন করিবার জন্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী লক্ষীপ্রিয়ার সহিত পুরী গমন করেন। সেখানে কিছুদিন শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গে বাস করিয়া চাখন্দি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সন্তান হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহাদের একটী পুত্র সন্তান হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে এই সন্তানের জন্ম হওয়ায় তাঁহারা মনে করিলেন যে শ্রীচৈতন্যদেবের আশীর্ব্বাদেই তাঁহাদের এই সন্তান লাভ হইল। অথবা উত্তরকালে এই সন্তানের চৈতন্য ভক্তি ও বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ দেখিয়া তাহার চরিতাখ্যায়কেরা এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক চৈতন্যদাস ও লক্ষীপ্রিয়া মহা আনন্দে সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলেন এবং যথাসময়ে তাহাকে শ্রীনিবাস নাম দিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীনিবাসের জন্ম হয় কিন্তু কোন সালে, চরিতাখ্যায়কেরা তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। অনুমান করা যাইতে পারে যে ১৫১২ হইতে [illegible] খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সালে তাঁহার জন্ম হয়। কেননা, ১৫০৯ [illegible] চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাহার পর কয়েক বৎসর [illegible] ভ্রমণ করিয়া তিনি নীলাচলে অবস্থান করেন। সেই সময়ে [illegible] দাস সস্ত্রীক তাঁহাকে দর্শন করিতে চান।

অল্প বয়সেই শ্রীনিবাসের জ্ঞান ও ধর্ম্মানুরাগ পরিস্ফুট হয়। চাখন্দি-গ্রামে সে সময়ে অনেক বিদ্বান অধ্যাপক বাস করিতেন। শ্রীনিবাস ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতি, নামক তাঁহাদেরই একজনের নিকটে ব্যাকরণ কোষ, অলঙ্কার প্রভৃতি তৎকালপ্রচলিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন

এবং স্বীয় পিতার নিকটে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন। শ্রীনিবাসের যৌবনের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি জননী সমভিব্যাহারে চাখন্দি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতামহের বাসস্থান যাজগ্রামে গমন করেন। তখন তাহার বয়স কত ছিল নিশ্চয় করিয়া জানা যায় না কিন্তু অষ্টাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই তাঁহার মনে গভীর ধর্ম্মানুরাগ জন্মিয়াছিল তাহা নিশ্চিত। কেন না যে বৎসরে শ্রীচৈতন্যদেব পরলোকগমন করেন (অর্থাৎ ১৫৩৪ খৃঃ) সেই বৎসর শ্রীনিবাস তাঁহাকে দর্শনের জন্য পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই সংবাদ পান যে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব হইয়াছে। তখন শ্রীনিবাসের বয়ঃক্রম আঠারো হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে হইবে। প্রেমবিলাসরচয়িতা এ সময়ে তাঁহাকে বালক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

"বালক দেখিয়া হৈল আনন্দ অন্তর।" প্রেঃ বিঃ ৪।

এই সংবাদে শ্রীনিবাস অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। শোকাবেগ প্রশমিত হইলে তিনি পুরী গমন করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত, গোস্বামী পণ্ডিত, বক্রেশ্বর, শ্রীপরমানন্দ প্রভৃতি গৌরভক্তগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কিছুকাল তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিয়া তাঁহাদের অনুমতিক্রমে শ্রীনিবাস গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন। লিখিত আছে, অল্পদিন পরেই তিনি আবার নীলাচলে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে পণ্ডিত গদাধরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পুরীগমনের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এবং তৎপরিবর্ত্তে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে চলিলেন। বোধ হয় যৌবনের উচ্ছ্বসিত ধর্ম্মানুরাগে এই সময়ে তিনি সাধু ও তীর্থদর্শনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান পুরুষগণের কাহারও সঙ্গেই তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি পুরী পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব হইয়াছিল—সেইরূপ নবদ্বীপের পথেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দের মৃত্যু সংবাদ পান।

সে সময়ে নবদ্বীপে বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ণ জোয়ার।

"ভুবন মঙ্গল সংকীর্ত্তন ঘরে ঘরে।
আনন্দের নদী বহে নদীয়া নগরে॥"

শ্রীনিবাস এই দৃশ্য দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন।

"দেখিয়া আত্মবিস্মরিত হইল শ্রীনিবাস।
কে কহিতে পারে যৈছে বাড়িল উল্লাস॥"

নবদ্বীপ গিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া, এবং শ্রীমুরারী, শ্রীবাস পণ্ডিত, দামোদর, সঞ্জয় বিজয়, দাসগদাধর প্রভৃতির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। কয়েক দিবস নবদ্বীপে বাস করিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের বাসস্থান দেখিবার জন্য শান্তিপুর গমন করেন। প্রেমবিলাসের মতে তাঁহার চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্যের পরলোকগমন হয়। "ত্রয়োদশ বৎসর গোসাঞির যত্রাস। প্রে-বি-৪। তথা হইতে শ্রীনিত্যানন্দের বাসস্থান খড়দহ গমন করেন। সেখানে নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী দেবী ও তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এ সকল স্থানে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার নাম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুরাগের কথা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সকলেই তাঁহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। খড়দহের বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে কৃষ্ণনগর, খানাকুলনিবাসী নিত্যানন্দভক্ত অভিরাম গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। তিনিও সানন্দে সেখানে গেলেন। সেখানে অভিরাম গোস্বামীও তাঁহার পত্নী মালিনী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও

তাঁহার দেশভ্রমণ ও ভক্তদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। এখন তাঁহার বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের চরণদর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইল। অল্পদিন পরে যাজগ্রামে গমন করিয়া মাতার অনুমতি লইয়া তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে রাঢ়দেশে নিত্যানন্দের জন্ম স্থান একচক্রা গ্রাম দর্শন করেন। তথা হইতে গয়া এবং তৎপরে কাশী গমন করেন। কাশীতে চন্দ্রশেখরের বাসস্থান দর্শন করিলেন। তখনও সেখানে চন্দ্রশেখরের শিষ্য ও কোন কোন বৈষ্ণব বাস করিতেন। কয়েকদিন তাঁহাদের সহবাস করিয়া তিনি প্রয়াগ ও অযোধ্যা হইয়া বৃন্দাবন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পুরী ও শান্তিপুরের পথে যেমন হইয়াছিল এখানেও তাহাই হইল। মথুরা পৌঁছিয়া সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ও কাশীশ্বর গোস্বামীর পরলোকগমন সংবাদ পাইলেন। এই নিদারুণ সংবাদে শ্রীনিবাস অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। এমন কি ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থপ্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন যে মনের দুঃখে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন গমনের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া তিনি পূর্ব্বমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাত্রিতে রূপ ও সনাতন স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ স্বপ্নদর্শনের বিবরণ অনেক আছে। গ্রন্থকর্ত্তা কথায় কথায় স্বপ্নে মৃতব্যক্তিগণকে আনিয়াছেন। ইতিপূরে পুরী ও শান্তিপুরের পথে শ্রীচৈতন্যদেব, অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ, তিনজনেই স্বপ্নে শ্রীনিবাসের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যাহাহউক, শোকের প্রথম আবেগে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন সংকল্প পরিত্যাগ অসম্ভব নহে। কিন্তু রাত্রির বিশ্রামের পর মন শান্ত হইলে বুঝিলেন এত নিকটে আসিয়া বৃন্দাবন এবং অবশিষ্ট মহান্তগণকে দর্শন না করিয়া যাওয়া বাতুলতা

যাত্র। পরদিন প্রভাতে তিনি পুনরায় বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে তথায় পৌছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে তিনি যাজগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৃন্দাবন পৌছিতে তাঁহার পাঁচ মাস লাগিয়াছিল। বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি সাধু পুরুষের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গোপাল ভট্টের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনুরাগবল্লী গ্রন্থে দীক্ষার নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। :—

"প্রথমে করিল শ্রীহরি নাম।
তবে রাধাকৃষ্ণ দুই মন্ত্র অনুপাম॥
পঞ্চনাম শুনাইয়া সিদ্ধ নাম দিল।
শ্রীমণিমঞ্জরী গুরুমুখেতে শুনিল॥
আপনার নাম কহে শ্রীগুণমঞ্জরী।
শ্রীরূপস্বাক্ষর গণোদ্দেশ মধ্যে ধরি॥
সেবা পরায়ণা সখী পরিচর্য্যা প্রধান।
অতএব দাসী বলি কহয়ে আখ্যান॥
এই ব্রজ বৃন্দাবনে পরকীয়া লীলা।
সমরণ মঙ্গলে শ্রীরূপদিশা দেখাইলা॥
শ্রীরূপমঞ্জরী যূথে সভার অনুগতি।
যেমত ভাবনা তেনমত হয়ে প্রাপ্তি॥
শ্রীরাধারমণ হয় ব্রজেন্দ্র কুমার।
বাসুদেবাদি স্পর্শ নাহিক রাধার॥
সে রাধার মন হয় শচীর নন্দন।
অভেদ করিয়া সদা করিহ ভাবন॥"

দীক্ষাকালে গোপাল ভট্ট তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন প্রেমবিলাস গ্রন্থে তার নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

"এই সব মন্ত্র তুমি করিবে স্মরণ।
যেই কালে তদাশ্রয়ে করিবে মনন॥
গুণমঞ্জরিকাশ্রয়ে মণিমঞ্জরিকা তুমি।
তোমার যূথের বিবরণ কহি সব আমি॥
রূপ গুণ রতি রস মঞ্জুলা মঞ্জুল।
এই সব সঙ্গে সঙ্গী এই অনুকূল॥
সেবা রাগাত্মিকা রাগ ভজনের মত।
শ্রীরূপ গোসাঞির বাক্য আছয়ে সম্মত॥
সেবা নাম সাধকের যত বড় আর্ত্তি।
তাহা সিদ্ধ হৈলে হয় এই সব প্রাপ্তি॥
সাধন করয়ে দেহ সাধক নাম হয়।
সখীর আশ্রয়ে সিদ্ধি জানিহ নিশ্চয়॥
চতুঃষষ্ঠি আদি সাধন কহিল অনেক।
আনুকূল্য প্রাতিকুল্য বুঝিবে পরতেক॥
প্রাতিকূল্য যে হয় তারে করিব বর্জ্জন।
আনুকূল্য যেবা হয় প্রাপ্তির কারণ॥
সেবা নামাপরাধ যত রক্ষার কারণ।
অন্তরে প্রবেশি হানি করয়ে ভাজন॥
কৃষ্ণ ভক্তির অঙ্গ হয় সাধনের প্রাপ্তি।
অন্যমত করিলে সাধন উড়ি যায় কতি॥
কৃষ্ণে মন কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবার কারণ।
সেই অঙ্গ করে তাহে প্রাপ্তি নিরূপণ॥

কিসে অপরাধ হয় শুন শ্রীনিবাস।
বিস্তারিয়া কহি আমি করিয়া প্রকাশ ॥
না করে ভক্তির অঙ্গ নিন্দয়ে আপনে।
প্রাপ্তি নাহি হয় তার যায় অন্য স্থানে ॥
বটবীজ ক্ষুদ্র অতি বৃক্ষ অতি হয়।
অপরাধ দিনে দিনে বাড়িয়া পড়য় ॥
দেবতা নিন্দন জীবে দুঃখ আদি যত।
ইথে নীলুব্ধ চিত্ত যার ভক্তি হয় তত ॥
যখন দেখিবা শাস্ত্র তখন জানিবা।
সেই ক্ষণে মোর বাক্য সত্য করি লবা ॥
এই পথে পথি হইলে হও সাবধান।
কৃষ্ণ ভাজন সাধু মাত্র ইহার প্রমাণ ॥”

তৎপরে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভাগবত এবং সনাতনরূপ প্রণীত ভক্তি গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। ঠিক কতদিন তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে সাধারণ ভক্তগণের মত কেবল বৃন্দাবনদর্শন করিয়াই তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। মনে হয়, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সঙ্গে তিনি গভীর ভাবে ভক্তিধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র সকল পাঠ ও আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীগণের রচিত গ্রন্থ সকল গৌড় দেশে আনয়ন ও প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রধান কার্য্য। বৃন্দাবনে বসিয়া সনাতনরূপ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি, বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশে তাহার প্রচার হয় নাই। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে আসিয়া তাহার সংবাদ পাইলেন। জ্ঞানানুরাগী শ্রীনিবাস বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই

সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীও আনন্দের সঙ্গে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন ; শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ব্রজবাসী মহান্তগণের সম্মতিক্রমে শ্রীনিবাসকে আচার্য্য উপাধি প্রদান করিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃন্দাবনে অবস্থিতি কালে নরোত্তম দাসও বৃন্দাবনে আগমন করেন। পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় উভয়েই পরমানন্দ লাভ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে জীবনব্যাপী ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। তাঁহারা একত্র বৃন্দাবনে নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনের অন্তর্গত নানা তীর্থস্থান দেখাইবার জন্য রাঘব পণ্ডিত নামক একজন মহান্তকে নিয়োজিত করেন। এই রাঘব পণ্ডিত দাক্ষিণাত্য দেশবাসী একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন।

"দাক্ষিণাত্য বিপ্র মহাকুলীন প্রচার।
পরম বৈষ্ণব ক্রিয়া কে বর্ণিবে তার" ॥
"দীনহীনে অনুগ্রহ সীমা দেখাইলা।
ভক্তিরত্ন প্রকাশাদি গ্রন্থ যে বর্ণিলা ॥"

ইনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে বাস করিতেন কিন্তু অনেক সময়েই বৃন্দাবনের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

"মধ্যে মধ্যে ব্রজেতে ভ্রমণ করে রঙ্গে।
মধ্যে মধ্যে রহে দাস গোস্বামীর সঙ্গে।"
কভু কভু একযোগে আসি বৃন্দাবনে।
মহানন্দ পায় প্রভুগণের দর্শনে।
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরিত্র সদা গায়।
না ধরে ধৈরয নেত্রজলে ভাসি যায়।"

এই অনুরাগী অভিজ্ঞ ব্রজবাসী বিপ্র শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে ব্রজের অন্তর্গত সকল তীর্থ দর্শন করান।

শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে অবস্থানকালে বৈষ্ণব ইতিহাস প্রসিদ্ধ আর একজন যুবকের সঙ্গে মিলন হয়। তিনি উত্তরকালে উৎকল প্রদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শ্যামানন্দ নামে পরিচিত। শ্যামানন্দ নরোত্তমের পরে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ একত্রে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ মহাসমারোহে তাঁহাদিগকে বিদায় দেন। তাঁহারা একে একে সকল মহান্তগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষই চক্ষুজলে ভাসিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাদের ভক্তি ও প্রীতির বর্ণনা পাঠ করিয়াও মুগ্ধ হইতে হয়। বৈষ্ণবগণ কেবল ভগবদ্ভক্তি সাধন করেন নাই কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ হইয়াছিল তাহাও অপূর্ব্ব।

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখে অতিশয় কাতর হইলেন। এমন কি লিখিত আছে যে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

"প্রভুর সঙ্গে রহি সদা মোর মনে ছিলা।
বৃন্দাবনে বাস আর প্রভুর সেবন।
ইহা ছাড়ি কেমনে গৌড়ে করিব গমন॥" (কর্ণানন্দ)

প্রেমবিলাস রচয়িতাও এইরূপ লিখিয়াছেন।

"যদি আজ্ঞা হয় প্রভু রহি বৃন্দাবনে।
প্রভুর চরণ সেবা করি রাত্রি দিনে॥"
"সবার দর্শন করি অন্যমন নয়।
সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা পায় যদি আজ্ঞা পায়॥" (প্রেমবিলাস)

কিন্তু শ্রীজীবপ্রমুখ গোস্বামিগণ বলিলেন, "না, তোমরা গৌড়দেশে

যাও, সেখানে প্রভু তোমাদের দ্বারা অনেক কার্য্য করাইবেন। গৌড়ে গিয়া ভক্তিগ্রন্থ প্রচার কর।"

"এই গ্রন্থ লইয়া তুমি গৌড় দেশে যাহ।
মহা প্রভুর আজ্ঞা যাহে গ্রন্থরাশি লহ।" (কর্ণানন্দ)

গৌড়দেশে ভক্তিগ্রন্থ আনয়নের প্রস্তাব জীব গোস্বামীর অথবা শ্রীনিবাসের হৃদয় হইতে উঠিয়াছিল ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবগ্রন্থে জীব গোস্বামীকেই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই ইচ্ছা প্রথমতঃ শ্রীনিবাসের হৃদয়ে উত্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক এই কার্য্যের ভার শ্রীনিবাসের হস্তেই সমর্পিত হইয়াছিল। কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদেব আকাশবাণীতে ভট্টগণের নিকট তাঁহার এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কর্ণানন্দ রচয়িতা বলেন শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকটে এই আদেশবাণী হয়।

"রসাস্বাদন হেতু গৌড়ে অবতার।
আস্বাদন করিলা রস বিবিধ প্রকার॥
যে লাগিয়া অবতার জানহ কারণ।
ভাসাইলাম সব জনে দিয়া প্রেমধন॥
মোর শক্তিতে জন্ম ইহার করিল প্রকাশ।
প্রেমরূপে হইল জন্ম নাম শ্রীনিবাস॥
ইহার সম্বন্ধচিত্তে ধরিব যেই জন।
সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণ।
শীঘ্র গৌড়দেশে সবে দেহ পাঠাইয়া।
গমন করুন ইথে গ্রন্থরাশি লইয়া॥"

ইহা হইতে মনে হয় গৌড়ে ভক্তিগ্রন্থ প্রেরণ ইচ্ছা প্রথমে যাঁহার

হৃদয়েই উত্থিত হউক না কেন সকলেই এই প্রস্তাব পরম উৎসাহে সমর্থন করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে যাত্রার দিন স্থির হইল। জীব গোস্বামীর আদেশে মথুরাবাসী একজন মহাজন একখানি শকট ও চারিটী বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ আনয়ন করিলেন। গ্রন্থ সকল একটি কাষ্ঠসম্পূটে বদ্ধ করিয়া শকটে রাখা হইল, সঙ্গে দশজন প্রহরী। শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে গ্রন্থ লইয়া যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ কতকদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। প্রথম দিন তাঁহারা মথুরা গিয়া বিশ্রাম করিলেন। শ্রীজীব রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি কয়েকজন মথুরা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহারা বৃন্দাবন প্রত্যাগমন করিলেন এবং শ্রীনিবাস প্রভৃতি গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কতকদূর আসিয়া নীলাচলযাত্রী একদল লোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া ঝারিখণ্ডের বনপথে যাইতে মনস্থ করিলেন।

এই পথ দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম দূর। এই পথের বিশেষ আকর্ষণ যে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরূপ এবং সনাতন গোস্বামী এই পথ দিয়া যাতায়াত করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে এবং সঙ্গে বহুসংখ্যক লোক থাকায় শ্রীনিবাস এই পথেই চলিলেন। নির্ব্বিঘ্নে বহুপথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। এখন গৌড়দেশের সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, আর বেশী পথ বাকী নাই ভাবিয়া তাঁহারা অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু এখানে এক অতর্কিত বিপদ ঘটিল যাহা হইতে পরিণামে প্রভূত মঙ্গল ঘটিয়াছিল। এই সময়ে বীরহাম্বির নামে এক ব্যক্তি বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহার অধীনে বহু দস্যু ছিল। তাহারা তাঁহার ইঙ্গিত

অনুসারে পথযাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। শ্রীনিবাস বহু লোক সমভিব্যাহারে শকটবাহন কাষ্ঠসম্পুট লইয়া যাইতেছেন শুনিয়া তাহারা মনে করিল কোনও বণিক ধনরত্ন লইয়া যাইতেছে। রাজাকে এই সংবাদ দিলে তিনি শকট অপহরণ করিতে আদেশ দিলেন। এক রাত্রিতে শ্রীনিবাসপ্রমুখ যাত্রীদল আহারাদির পর বৃক্ষতলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময় দস্যুগণ সুযোগ দেখিয়া গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল। প্রভাতে নিদ্রা-ভঙ্গের পর গাড়ী না দেখিয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বজ্রাহতের ন্যায় হইলেন। তাহাদের মনের অবস্থা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। গোস্বামীগণের আজীবনের তপস্যার ধন অমূল্য গ্রন্থসকল কত শ্রমে এবং কত যত্নে যাহা তাঁহারা লইয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ তাহা নষ্ট হইয়া গেল ভাবিয়া তাঁহারা শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। শোকের প্রথম বেগ উপশম হইলে শ্রীনিবাস নরোত্তম দাসকে বলিলেন তুমি শ্যামানন্দকে লইয়া দেশে গমন কর এবং গোস্বামীদের আদেশমত তাঁহাকে উৎকলে পাঠাইয়া দাও। আমি গ্রন্থ না লইয়া দেশে ফিরিব না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে ধনরত্ন মনে করিয়া কোন দস্যুদল গ্রন্থ অপহরণ করিয়াছে। যখন দেখিবে যে সম্পুটে ধনরত্ন নাই কেবল পুস্তক আছে তখন তাহারা সহজেই ফিরাইয়া দিবে। শ্রীনিবাসের পরামর্শানুসারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরোত্তম ও শ্যামানন্দ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থের সন্ধানে ইতঃস্তত ঘুরিতে লাগিলেন।

এদিকে দস্যুদল গ্রন্থসহ গাড়ী লইয়া রাজা বীরহাম্বিরের সম্মুখে উপস্থিত করিল। রাজা সম্পুট খুলিয়া বিস্মিত হইলেন; দেখিলেন তাহার মধ্যে ধনরত্নের পরিবর্ত্তে স্তরে স্তরে পুস্তক সজ্জিত রহিয়াছে।

বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে যে গ্রন্থ দেখিয়া বীরহাম্বীরের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

"গ্রন্থ দৃষ্টি মাত্রেতে হইল শুদ্ধ মন।
পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ রত্নে করে সন্দর্শন॥"

তাঁহারা অবশ্য ইহাতে অলৌকিক ব্যাপারই কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা বীরহাম্বীরের মনের অবস্থা স্বাভাবিক কারণেও বুঝা যাইতে পারে। ধনরত্নের পরিবর্ত্তে গ্রন্থ দেখিয়া তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন কোন ধার্ম্মিক লোক বহু যত্নে এই গ্রন্থসকল লইয়া যাইতেছেন। রাজা হাম্বীর দস্যুদলের নায়ক হইলেও একেবারে মন্দ লোক ছিলেন না। বিশেষতঃ, দেখা যায় যে তাঁহার সভায় প্রতিদিন ভাগবত পাঠ হইত। রাজা বীরহাম্বীর শ্রদ্ধার সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন।

তিনি মনে করিলেন যে যাঁহার গ্রন্থ তাঁহার সন্ধান পাইলে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। এই ভাবিয়া প্রহরীগণকে সযত্নে গ্রন্থ রাখিয়া দিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য গ্রন্থের অন্বেষণ করিতে করিতে বিষ্ণুপুর আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে এক ব্রাহ্মণতনয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। এবং তাঁহার সঙ্গে রাজ সভায় ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে যান। লিখিত আছে যে তাঁহাকে দেখিয়াই রাজা মনে করিলেন যে ইনিই গ্রন্থের অধিকারী হইবেন।"

"আচার্য্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে।
ভূমে পড়ি প্রণমি আপনা ধন্যমনে॥
* * *
বসিতে দিলেন আনি অপূর্ব্ব আসন।
ইহ গ্রন্থরত্নের অধ্যক্ষ সুনিশ্চয়।

মোর ভাগ্যে অকস্মাৎ দিলা দর্শন।
করিনু ইহার পদে আত্ম সমর্পণ॥"

তদনন্তর রাজা বীরহাম্বীর তাঁহাকে কিছু ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা এবং সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইলেন। পাঠান্তে রাজা প্রাসাদে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিলেন। আহার ও বিশ্রামান্তে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিবাস শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংক্ষেপেই সকল বিবরণ দিলেন। বৃন্দাবন হইতে গোস্বামীগণের রচিত গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে গ্রন্থচুরি হয় এবং তাহার সন্ধানে এখানে আসিয়াছেন তাহাও বলিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীনিবাসের চরণে পড়িয়া তিনিই যে গ্রন্থ অপহরণ করিয়াছেন তাহা বলিলেন, এবং বলিলেন সমুদয় গ্রন্থই তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য এই সংবাদে পরমানন্দিত হইলেন। রাজা বীরহাম্বির তদবধি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরম ভক্ত হইলেন। এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যকে কিছুদিন বিষ্ণুপুর থাকিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্রীনিবাস তাহাতে সম্মত হইলেন। বৃন্দাবন হইতে তাঁহার সঙ্গে যে সকল লোক আসিয়াছিল, এখান হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া পাঠাইলেন। এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পত্রদ্বারা সকল সংবাদ দিলেন। যে গাড়ীতে গ্রন্থ আসিয়াছিল রাজা বীরহাম্বির তাহা পূর্ণ করিয়া গোস্বামীগণের নিকট বহু মূল্য উপঢৌকন পাঠাইলেন। রাজার দূত দ্বারা নরোত্তম ঠাকুরের নিকটেও সকল সংবাদ জানাইলেন।

বিষ্ণুপুরে নিত্য ভাগবত গ্রন্থাদি পাঠ হইতে লাগিল; রাজা ও রাজ-মহিষী দিনে দিনে শ্রীনিবাসের পরম অনুরাগী হইলেন এবং বহু-সংখ্যক লোক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। শ্রীনিবাস গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন সুতরাং এ যাত্রা আর বেশী বিলম্ব করিলেন না। পরে পুনরায় বিষ্ণুপুর আসিবেন বলিয়া রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজা বীরহাম্বির তাঁহার সঙ্গে শকটপূর্ণ করিয়া গ্রন্থ ও বহু উপঢৌকন পাঠাইলেন। যথাসময়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য যাজগ্রামে পৌঁছিলেন। গৌড়বাসী বৈষ্ণবগণ এ সংবাদে পরমানন্দিত হইলেন। নানা স্থান হইতে তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং তিনিও স্থানে স্থানে গিয়া প্রাচীন মহান্তগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে তিনি যাজগ্রামে বসিয়া ভক্তিগ্রন্থ অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ আসিতে লাগিল। ক্রমে বহুলোক তাঁহার শিষ্য হইল। যাজগ্রাম গৌড়দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে রামচন্দ্র কবিরাজের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার পরিচয় ও মিলনের বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরে শ্রীনিবাসের মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে শ্রীনিবাস ব্যথিত ও বিপন্ন হইলেন। গৃহে অন্য স্ত্রীলোক নাই; এখন শ্রীনিবাসের বহু শিষ্য ও পোষ্য। গৃহকর্ম্ম কে দেখে! রঘুনন্দন প্রভৃতি হিতৈষীগণের অনুরোধে শ্রীনিবাস আচার্য্য দারপরিগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন। তখন রঘুনন্দন শ্রীনিবাসের উপযুক্ত কন্যা অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। যাজগ্রামেই গোপালদাস চক্রবর্ত্তী নামক

এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দ্রৌপদী নামে একটি সুরূপা ও সদ্‌গুণসম্পন্না কন্যা ছিল। তাঁহার সহিত শ্রীনিবাসের বিবাহ হইল। এখন তিনি নিশ্চিন্তমনে শাস্ত্র চর্চ্চা ও অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শুক্লাম্বর আচার্য্য, নরহরি সরকার, গদাধর দাস প্রভৃতি ভক্তগণের পরলোকগমনে শ্রীনিবাস অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তাঁহাদের শোকে অধীর হইয়া তিনি দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রা করেন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে যাজগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বসন্ত পঞ্চমীর দিন বৃন্দাবন পৌঁছিলেন। এত অল্পদিনের মধ্যে বৃন্দাবনে পুনরাগমনে তথাকার মহান্তগণ একদিকে যেমন সুখী হইলেন অপরদিকে সেইরূপ বিস্মিতও হইলেন। শ্রীনিবাসের নিকটে গৌড়ের ভক্তগণের পরলোকগমনের সংবাদে তাঁহারাও দুঃখিত হইলেন। এদিকে শ্রীনিবাসের শিষ্যগণ তাঁহার অভাবে বিমর্ষ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যুক্তি করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রামচন্দ্রকে বৃন্দাবন প্রেরণ করিলেন। শ্রীনিবাসের যাত্রার একমাস পরে পৌষ মাসে রামচন্দ্র বৃন্দাবন যান। শ্রীনিবাস রামচন্দ্রকে পাইয়া প্রীত হইলেন, এবং তথাকার বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। গোস্বামীগণ রামচন্দ্রের শাস্ত্রজ্ঞান ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন। রামচন্দ্র কয়েকমাস বৃন্দাবনে থাকিয়া তত্রত্য বৈষ্ণবগণ ও তীর্থ স্থানগুলি দর্শন করতঃ বৈশাখী পূর্ণিমার পরদিবস শ্রীনিবাস আচার্য্যকে লইয়া গৌড় যাত্রা করেন। তাঁহাদের সঙ্গে শ্যামানন্দও আসেন। তিনি পূর্ব্বেই বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। পথে বনবিষ্ণুপুরে তাঁহারা দুই মাস অবস্থিতি করেন। রাজা বীরহাম্বীর তাঁহাদিগকে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন। রামচন্দ্র কবিরাজও শ্যামানন্দের পরিচয় পাইয়া তিনি

তাঁহাদিগকে বহু সম্মান করিলেন। শ্যামানন্দ বহুদিন পূর্ব্বে উৎকল ত্যাগ করিয়াছিলেন; সেইজন্য দশদিন মাত্র তথায় থাকিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রামচন্দ্র কবিরাজ তাহার পরও অনেকদিন বিষ্ণুপুরে থাকিয়া রাজা বীরহাম্বীরকে গভীরতর ধর্ম্মসাধনে প্রবর্ত্তিত করেন। এ যাত্রায়ও রাজধানী ও নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যাজগ্রামের শিষ্যগণ তাঁহার বিষ্ণুপুর আগমনের সংবাদ পাইয়া শীঘ্র গৃহে ফিরিবার জন্য পত্র লেখেন। তদনুসারে বিষ্ণুপুরে আর অধিক দিন না থাকিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজগ্রামে আগমন করেন।

কয়েকদিন বিশ্রামের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডে গমন করেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন তথায় গদাধর দাস ও নরহরি ঠাকুরের মৃত্যুদিন উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসর কার্ত্তিক মাসে গদাধর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ব হইতেই উৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন। নানাস্থানের ভক্ত ও মহান্তগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। খড়দহ হইতে নিত্যানন্দতনয় বীরভদ্র এবং শান্তিপুর হইতে অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র গোপাল মিশ্র ও কৃষ্ণ মিশ্র আসিবেন। যদুনন্দন মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্যকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীনিবাস সানন্দে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কাটোয়া হইতে শ্রীখণ্ডে গিয়া দেখিলেন সেখানেও নরহরি ঠাকুরের মৃত্যুদিন উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। গদাধর দাসের তিরোভাবের অল্পদিন পরেই পূর্ব্ব বৎসর অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাএকাদশী দিবসে নরহরি ঠাকুর মহাশয় পরলোক গমন করেন। তাঁহার শিষ্য রঘুনন্দন উক্ত দিনে উৎসবের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কাটোয়ায়

বীরভদ্রপ্রমুখ মহান্তগণের আগমনের সম্ভাবনা শুনিয়া তিনি অধিকতর উৎসাহিত হইলেন। স্থির হইল সমাগত বৈষ্ণবগণ কাটোয়ার উৎসবের পরে শ্রীখণ্ডে আসিয়া মহোৎসবে যোগ দিবেন। শ্রীনিবাসও অবশ্য আসিবেন। যথাসময়ে কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডে মহা-সমারোহে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইল। উভয় স্থানেই শ্রীনিবাসকে মহোৎসবের তত্ত্বাবধানের প্রধান ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কয়েকমাস পরে কাঞ্চনগড়িয়াতেও আর একটি মহোৎসব হয়। তথাকার প্রাচীন বৈষ্ণব চৈতন্যদেবের সঙ্গী হরিদাস আচার্য্য পূর্ব্ব বৎসর মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। শ্রীনিবাস পিতার মৃত্যুদিনে তাঁহাদিগকে কাঞ্চনগড়িয়ায় উৎসবের আয়োজন করিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশে ভ্রাতৃদ্বয় গৃহে আসিয়া সোৎসাহে সকল ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য রামচন্দ্র প্রভৃতি শিষ্যগণকে লইয়া, কাঞ্চনগড়িয়ায় মহোৎসব সমাধা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীদাস ও গোকুলানন্দকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষাও দেন। এই সকল উৎসব উপলক্ষে ভক্তির তরঙ্গ বহিত এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার হইত। এই সময়ে কাঞ্চনগড়িয়া ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের অনেকে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

কাঞ্চনগড়িয়ার মহোৎসবের পরে শ্রীনিবাস সশিষ্যে বুধরি গমন করেন। এই যাত্রায় তিনি রামচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দেন। গোবিন্দ গ্রহনীরোগে পীড়িত হইয়া মৃত প্রায় হইয়া-ছিলেন। তিনি ভ্রাতাকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত তথায় আসিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করেন। তদনুসারে রামচন্দ্র কবিরাজ

শ্রীনিবাসকে লইয়া বুধরী আসেন এবং সেখানে গোবিন্দের দীক্ষা হয়। স্থানান্তরে তাঁহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহার অল্পদিনপরেই খেতরীর মহোৎসব হয়। নরোত্তম ঠাকুর খেতরীতে চৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপনের আয়োজন করিতে ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বুধরী আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শের জন্য ঠাকুর মহাশয় তথায় আগমন করিলেন। সেখানে সকল যুক্তি স্থির হয়। শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহোৎসবের দিন স্থির হইল। নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য্যের উপর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ভার অর্পণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে মহা সমারোহে খেতরীতে মহোৎসব সম্পন্ন হয়। অন্যত্র তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর রামচন্দ্র সহ নবদ্বীপ ভ্রমণে বহির্গত হন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ইতিপূর্ব্বে একবার নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা বেশীদিন সেখানে ছিলেন না। এবার বিশেষরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাক্ষেত্র পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা। এখন নবদ্বীপের প্রাচীন ভক্তগণ প্রায় সকলেই পরলোকগমন করিয়াছেন। তথায় পৌঁছিয়া দেখিলেন চৈতন্যদেবের বাস-গৃহে একমাত্র প্রাচীন ভৃত্য বৃদ্ধ ঈশান শোক দুঃখে মুহ্যমান হইয়া দিন যাপন করিতেছিলেন। ঈশান তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং ক্রমে চৈতন্যদেবের লীলাস্থান সকল একে একে দেখাইলেন। নবদ্বীপ হইতে তাঁহারা যাজগ্রাম প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার অল্পদিন পরে ঈশানও পরলোকগমন করেন।

তাঁহাদের যাজগ্রাম প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরেই রাজা বীর-হাম্বীর সেখানে আসেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য পূর্ব্বেই তাঁহাকে

আসিবার জন্য লিখিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি সস্ত্রীক এই সময়ে যাজগ্রামে পৌছেন। এখানে নরোত্তমের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ভক্তদ্বয় তাঁহাকে লইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিতে মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রাজা বীরহাম্বীরও তাঁহাদের সহবাসে প্রভূত আনন্দ ও উপকার পাইলেন। এমন কি তিনি বলিয়াছিলেন যে আর গৃহে ফিরিবেন না। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু আচার্য্য ও ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে কিছুদিন তীর্থধর্ম্ম করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনকরতঃ কর্ত্তব্যপালনে উপদেশ দিলেন। এই সময়ে পরমেশ্বরী দাস জাহ্নবী দেবী নির্ম্মিত শ্রীরাধা মূর্ত্তি লইয়া নৌকাযোগে বৃন্দাবন যাইতেছিলেন। তাঁহাদের কাটোয়া গমনের সংবাদ পাইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যগণ সহ সেখানে গেলেন। বীরহাম্বীর সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রামচন্দ্রের হাতে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। তিনি গুরুদেবের জন্য এবং তাঁহার মহিষী দ্রৌপদীর জন্যও অনেক উপঢৌকন প্রদান করেন। অতঃপর কাটোয়া প্রভৃতি নানা স্থান দর্শন করিয়া রাজা বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুর প্রত্যাগমন করেন।

বীরহাম্বীরকে বিদায় দিয়া শ্রীনিবাস নরোত্তম ও রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত কাঞ্চনগড়িয়া ও বুধরী হইয়া খেতরী গমন করিলেন। এ যাত্রায় তিনি ১৫ দিন তথায় ছিলেন। সেই সময়ে সেখানে একটি ক্ষুদ্র উৎসব হয়। তথা হইতে আচার্য্য যাজগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার অল্পদিন পরে শ্রাবণের শুক্লাচতুর্থীতে কাটোয়ার প্রাচীন ভক্ত রঘুনন্দন পরলোকগমন করেন। তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে কাটোয়ায় মহোৎসব হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহার তত্ত্বাবধান করেন।

রাজা বীরহাম্বীরের গৃহপ্রত্যাগমনকালে আচার্য্য মহাশয় শীঘ্র বিষ্ণুপুর যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কাটোয়ার মহোৎসবের পর তিনি বিষ্ণুপুর যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহার জন্য পৃথক বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন হইতে অনেক সময়ে তিনি সেখানে আসিয়া বাস করিতেন।

এই সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন বৈষ্ণবনেতার ন্যায় শ্রীনিবাস আচার্য্য দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েন। এ বিষয়ে নরোত্তম ঠাকুরের চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। বৈষ্ণব জীবনচরিত লেখকেরা এই নিন্দনীয় কার্য্যের হীনতা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। কেন না দেখা যায়, বিবাহের সমর্থনের জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার স্বপ্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নামও এই কুৎসিত ব্যবহারের সহিত সংযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা লিখিয়াছেন চৈতন্যদেব স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া শ্রীনিবাসকে বিবাহ করিতে অনুমতি দেন। কুটচরিত্র নীতিপ্রধান চৈতন্যদেব দ্বিতীয়বার বিবাহে অনুমতি দিবেন একথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। শ্রীনিবাসকে বাঁচাইতে গিয়া গ্রন্থকার চৈতন্যদেবকে হীন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুর অবস্থান কালে এই বিবাহ হয়।' নিকটবর্ত্তী গোপালপুর গ্রামে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পদ্মাবতী নাম্নী সুরূপা ও গুণবতী কন্যার সহিত শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। বিবাহের পর পদ্মাবতীর নাম গৌরাঙ্গপ্রিয়া রাখা হইয়াছিল। রাজা বীরহাম্বীর এই বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করেন। কন্যার বয়স বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। কেন না দেখা যায়, ২৫ বৎসর বয়সে গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভে গতিগোবিন্দ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। বিবাহের অনেক দিন পরে এই সন্তানের জন্ম হইয়াছিল

বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রথমা পত্নী দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রীনিবাসের আর দুইটী পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাধাকৃষ্ণ। পুত্রগণের মধ্যে গতিগোবিন্দই সর্ব্বাধিক শক্তিশালী ও যশস্বী হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীনিবাসের তিনটি কন্যাও হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতিকা রাখা হইয়াছিল।

এখন হইতে কখনও বিষ্ণুপুর, কখনও যাজগ্রামে আচার্য্য মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রয়োজনমত খেতরী, বুধরী, কাঞ্চনগড়িয়া, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি বৈষ্ণবকেন্দ্রগুলিতে গতায়াত করিতেন। তত্রত্য বৈষ্ণবগণও অবসরমত যাজগ্রামে আগমন করিতেন। গভীর শাস্ত্রজ্ঞানে ও উন্নত ধর্ম্মভাবে তিনি এযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিচালক হইয়াছিলেন। খেতরীতে যেমন নরোত্তম ঠাকুর সুললিত সঙ্কীর্ত্তন সাহায্যে ভক্তিধারা প্রবাহিত করিতেছিলেন, যাজগ্রামে সেই প্রকার শ্রীনিবাস আচার্য্য শাস্ত্রচর্চ্চা ও গ্রন্থপ্রচারের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন। এই দুই ভক্তের মিলন মণিকাঞ্চনের যোগের ন্যায় হইয়াছিল। উভয়েই বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ঠিক কোন সময়ে তাঁহাদের তিরোভাব হয় তাহা জানা যায় না। কথিত আছে বৃন্দাবনে বৃদ্ধ বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর একবার খেতরী গমন করেন। সে সময়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হইয়াছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র প্রভৃতি অনেক মহান্ত তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। উৎসবান্তে শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজগ্রাম আসেন এবং তাহার কিছুদিন পরে বৃন্দাবন গমন করেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন, একাকী দীর্ঘ পথ যাইতে ভীত হইয়া রামচন্দ্রকে তাঁহার

সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে রামচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবন যান। তাঁহারা আর গৌড়ে ফেরেন নাই। উভয়েই তথায় দেহত্যাগ করেন। কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী তিথিতে বৃন্দাবন ও চাকন্দীতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরলোক গমন উপলক্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহান্তগণের মধ্যে নরোত্তম দাসের স্থান অতি উচ্চে। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে নিত্যানন্দের আবেশ অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য এবং তাঁহাদের সমসাময়িকগণের তিরোভাবের পরে তিনজন ভক্ত তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত কার্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই তিন জনের নাম শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ। বৈষ্ণবেরা এই তিনজনকে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের আবেশ অবতার বলিয়া মনে করেন। নরোত্তম দাসের জন্ম স্থান বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গড়ের হাট খেতরী গ্রাম। তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্তকে গড়ের হাটের রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি মুসলমান বাদশাহের অধীনস্থ একজন বড় জমিদার ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এক মাঘী পূর্ণিমার দিবস তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু কোন সালে তাহা জানিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সন্ন্যাসের পর যখন বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া রামকেলি হইতে ফিরিয়া যান সেই সময়ে তিনি রামকেলি অবস্থান কালে খেতরির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া "নরোত্তম" "নরোত্তম'' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা মনে করেন শ্রীচৈতন্যদেবের আকর্ষণে নরোত্তম দাসের জন্ম হয়।

এ সমুদয়ই পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণবগণের কল্পনা। তবে ইহাতে নরোত্তমের মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিকও নরোত্তম

উচ্চশ্রেণীর সাধক ও ভক্ত ছিলেন। রাজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইলেও বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিষয়ে বিরাগ দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে অন্নপ্রাশনের সময় তাঁহার মুখে অন্নপ্রদান করিতে গেলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তৎপরে দৈবজ্ঞের পরামর্শমত বিষ্ণুর ভোগ দিয়া তাঁহার মুখে অন্ন দেওয়া হইল তখন তিনি গ্রহণ করিলেন। এসব কথা কবিকল্পনা হইলেও অতি অল্প বয়সেই ধর্ম্মে তাঁহার যে অনুরাগ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সময়ে খেতরি গ্রামে কৃষ্ণদাস নামে একজন কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। বালক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। তিনি তাঁহার নিকটে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সঙ্গীগণের অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ক্রমে তিনি বৈষ্ণব ভক্তগণের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হইলেন; তাঁহার পিতা মাতা পুত্রের বৈরাগ্য দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। এমন কি তাঁহার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইল।

"এথা নরোত্তম প্রেমাবেশে সঙ্গোপনে।
কৃষ্ণ আরাধয়ে অশ্রুধারা দুনয়নে॥
নিরন্তর পরম বৈরাগ্য ভাব চিতে।
রাজভোগাদিক বার্ত্তা না পারে সহিতে॥
পুত্রের বৈরাগ্য ক্রিয়া দেখি ক্ষণে ক্ষণে।
কৃষ্ণানন্দরায় মহা চিন্তা যুক্ত মনে।
নরোত্তম বিনা কিছু নাহি ভয় আন।
তৈছে মাতা নারায়ণী পুত্রগত প্রাণ॥

সতত রক্ষক রাখিলেন পুত্র পাশে।
তথাপি হ নিরন্তর চিত্তে শঙ্কাবাসে॥"

নরোত্তম বিলাস, প্রথম বিলাস।

নরোত্তম পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া বৈষ্ণবভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। যাহার হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে তাহাকে বাহিরের কোন্ বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবে? কিছুদিন পরে নরোত্তমের পিতাকে রাজকার্য্যে একবার গৌড়ে যাইতে হইল। সেই সুযোগে নরোত্তম প্রহরীদিগের চক্ষুতে ধূলি দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ধরা পড়িবার ভয়ে অথবা সন্ধান পাইয়া পিতামাতা ফিরাইয়া আনিবেন এই চিন্তা করিয়া তিনি নবদ্বীপ বা নিকটবর্ত্তী অন্য কোনও স্থানে গেলেন না। এই সময়ে তাঁহার বয়স ঠিক কত তাহা জানিতে পারা যায় না। বোধ হয় ১৭।১৮ বৎসরের বেশী হইবে না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি গৃহে থাকিয়া দেশপ্রচলিত প্রথামত ব্যাকরণাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিবাহের জন্য কন্যার সন্ধান করিতেছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসরের কম ছিল না। ধরা পড়িবার ভয়ে নরোত্তম বনপথে চলিতে লাগিলেন। ১৫ দিনের পথ অতিক্রম করিলে তাঁহার উদ্বেগ কিছু কমিল; তখন তিনি রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন, যে সকল স্থান দিয়া তিনি গমন করিয়াছিলেন সেখানকার লোকেরা তাঁহার অদ্ভুত ধর্ম্মভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

"নরোত্তম নির্ব্বিঘ্নে চলয়ে রাজপথে।
জেছে প্রেম চেষ্টা তাহা কে পারে কহিতে॥

নিরন্তর গাহেন প্রভুর গুণ গান।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে ত্নয়ন ॥
যে জন বারেক নরোত্তম পানে চায়।
সে হেন সংসার দুঃখ হইতে এড়ায় ॥
যে গ্রামেতে নরোত্তম করয়ে রাত্রি বাস।
সে গ্রামে লোকের মনে বাঢ়য়ে উল্লাস ॥"

নরোত্তম বিলাস, প্রথম বিলাস।

এইরূপে নরোত্তম অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনে বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতা ছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য ইতিপূর্ব্বেই বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলী নরোত্তমকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন (এবং তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।) তরুণ বয়সে তাঁহার এই বৈরাগ্য এবং ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহারা যে মুগ্ধ হইবেন তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

"শ্রীজীব গোস্বামী তাঁরে ধরি করি কোলে।
সিঞ্চিলা তাঁহার অঙ্গ নিজ নেত্র জলে ॥"

তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে সকল বৈষ্ণবগণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য যখন শুনিলেন যে গৌড় হইতে অল্প বয়স্ক এক রাজকুমার আসিয়াছেন তখন স্বভাবতঃই তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইল। অল্পদিনে উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব জন্মিল। উভয়ের বয়স প্রায় সমানই হইবে সম্ভবতঃ শ্রীনিবাস কিছু জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হইয়াছিল এবং উত্তরকালে উভয়েই একহৃদয় হইয়া গৌড় দেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

অতঃপর নরোত্তম বৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধন করিতে

আরম্ভ করিলেন। তিনি কতদিন বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না ; সম্ভবতঃ বৎসরাধিক কাল হইবে। সে সময়ে বৃন্দাবন বৈষ্ণবদিগের প্রধান শিক্ষার স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। নানা স্থান হইতে ব্যাকুল আত্মাগণ আসিয়া এখানে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গোস্বামীগণ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য উপাধি প্রদান করিয়া স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য ইতিপূর্ব্বেই আসিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নরোত্তমেরও সেই প্রকার ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হইল। সম্ভবতঃ শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম একত্র বাস ও অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য ছিল। শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রকৃতি জ্ঞান-প্রধান, নরোত্তম ভক্তি-প্রধান। নরোত্তমের শিক্ষা শাস্ত্রাধ্যয়ন অপেক্ষা ভক্ত সঙ্গেই অধিক হইয়াছে। তখনও বৃন্দাবনে লোকনাথ, ভূগর্ভ, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি ভক্তগণ জীবিত ছিলেন। নরোত্তম ইঁহাদের চরণতলে বসিয়া ভক্তিধর্ম্ম সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে তিনি লোকনাথের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ভক্তগণের মধ্যে লোকনাথের জীবন ও চরিত্রেই তিনি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। লোকনাথও নরোত্তমকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তিনি কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু নরোত্তমের সেবায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরোত্তম জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে গভীর ভক্তি করিতেন।

কিছুদিন পরে উড়িষ্যা হইতে শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে সমাগত হন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে তাঁহার শিক্ষা ও সাধনের ব্যবস্থা হয় এবং ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার গাঢ় যোগ সংস্থাপিত হয়। শিক্ষা

সমাপনান্তে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ নরোত্তমকে ঠাকুর মহাশয় উপাধি প্রদান করেন এবং শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সহিত তাঁহাকে স্বদেশে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের প্রত্যাগমনবৃত্তান্ত শ্রীনিবাসাচার্য্যের জীবনীপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। পথে বনবিষ্ণুপুরের নিকটে গ্রন্থ চুরি হইলে শ্রীনিবাস অপহৃত গ্রন্থের সন্ধানে সেখানে রহিয়া গেলেন এবং নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে স্ব স্ব গৃহে যাইতে বলিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার আদেশ অনুসারে নরোত্তম শ্যামানন্দকে সঙ্গে লইয়া খেতরিতে আসিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে সেখানে মহানন্দের স্রোত বহিল। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে হারাইয়া গভীর শোকে মুহ্যমান ছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা নরোত্তমের কোন সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। নরোত্তম তাঁহাদের একমাত্র পুত্র। দীর্ঘকাল পরে নিরুদ্দেশ পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনে পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। খেতরিতে মহা আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, কিন্তু একটি কারণে তাঁহাদের সেই আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। পুত্রের প্রত্যাগমনে পিতামাতার আশা হইয়াছিল যে তিনি তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইবেন; কিন্তু নরোত্তম সবিনয়ে অথচ দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন যে তিনি আর বিষয়ে লিপ্ত হইবেন না। যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি খেতরিতেই অবস্থিতি করিবেন। কিন্তু তিনি চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। দারপরিগ্রহ করিবেন না, এবং রাজপ্রাসাদে ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিবেন না। তাঁহার জন্য পৃথক একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে, সেখানে থাকিয়া একাগ্রে তিনি ধর্ম্ম সাধন করিবেন। পিতামাতা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। তাঁহার বৈরাগ্য ও ভক্তি দেখিয়া

দেশবাসী সকলেরই মন গভীর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইল। সম্ভবতঃ ইতি-পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষ দত্তের উপরে বিষয় কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ এখন হইতে তিনি বিষয়কার্য্যের ভার পাইয়াছিলেন। নরোত্তম বিষয় হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইলেও সন্তোষ দত্ত এবং অপর সকলেই চিরদিনই তাঁহার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে ব্যগ্র থাকিতেন।

নরোত্তম কিছুদিন পিতামাতার নিকটে খেতরিতে বাস করিয়া শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপ দর্শনে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁহার কোন পরিচয়ই হয় নাই; অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইবার পরেই তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বভাবতঃই গৌড়ীয় ভক্তগণ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কেন্দ্রগুলি দর্শন করিতে ব্যগ্র হইলেন। পিতা মাতার অনুমতি লইয়া সর্ব্বপ্রথমে তিনি নবদ্বীপ গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই ইতিপূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ও দামোদর পণ্ডিত তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বহু সমাদরে গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বেই তাঁহারা নরোত্তমের বৈরাগ্য ও ভক্তির কথা শুনিয়াছিলেন। নরোত্তমকে দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় সুখী হইলেন। নরোত্তম ও তাঁহাদের দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীগণের দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই বলিয়া তিনি অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভক্ত নরোত্তমের জীবনের এই এক মহা-খেদ ছিল।

কিছুদিন নবদ্বীপে ভক্তগণের সঙ্গে বাস করিয়া ঠাকুর মহাশয় অদ্বৈতাচার্য্যের বাসস্থান শান্তিপুর গমন করিলেন। সেখানে আচার্য্যের

পুত্র অচ্যুতানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তথা হইতে নীলাচলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে অম্বিকানগরীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অম্বিকা বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

এখানে পণ্ডিত গৌরীদাস, শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা ও নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীহৃদয়চৈতন্য এই মন্দিরের মহান্ত ছিলেন। হরিনদী গ্রামের নিকট গঙ্গা পার হইয়া নরোত্তম পথের লোকদিগকে অম্বিকা কতদূর এবং শ্রীচৈতন্য ঠাকুর কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করিলেন। পথের লোকেরা বলিল আর অল্পদূরেই অম্বিকা। তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রে আসিয়া হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরকে সংবাদ দিল যে এক অপূর্ব্ব ভক্তযুবক তাঁহার নিকটে আসিতেছেন।

"দেখিল আশ্চর্য্য এক পুরুষ সুন্দর।
গৌর নিত্যানন্দ প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥"
আসিবেন এথা পথ জিজ্ঞাসা করিতে।
কত ধারা বহে নেত্রে না পারে চলিতে ॥"

শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর আগ্রহে বহির্দ্বারে আসিতেই নরোত্তমকে দেখিতে পাইলেন এবং দুই বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্যামানন্দের নিকটে তিনি ইতিপূর্ব্বেই নরোত্তমের কথা শুনিয়া থাকিবেন। শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দের গুরু ছিলেন, বৃন্দাবন হইতে উৎকল প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্যামানন্দ কয়েকদিন অম্বিকায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। নরোত্তমের অদ্ভুত ভক্তি দেখিয়া অম্বিকাস্থ ভাগবতগণ মুগ্ধ হইলেন। হৃদয়চৈতন্য পরম যত্নে নরোত্তমকে অম্বিকায় রাখিয়া শীঘ্র নীলাচল যাইতে উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। নরোত্তম

অম্বিকা হইতে খড়দহে গমন করিলেন। খড়দহে মহেশ পণ্ডিত প্রভৃতি বহু ভাগবতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিত্যানন্দের বিধবাদ্বয় শ্রীবসু ও জাহ্নবী তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নরোত্তম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। সেখানে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চারিদিন খড়দহে অবস্থান করিয়া নরোত্তম নীলাচলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে যে সমুদয় ভক্তের সন্ধান পাইলেন তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এখান হইতে শ্রীচৈতন্যদেব যে পথ দিয়া নীলাচলে গিয়াছিলেন সেই পথ ধরিয়া নরোত্তম নীলাচলের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে যে যে স্থানে চৈতন্যদেব বিশ্রাম করিতেন নরোত্তমও সেই সেই স্থানে বিশ্রাম করিলেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়াছেন অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের নিকটে তাঁহার বিবরণ শুনিলেন। যথাসময়ে নরোত্তম নীলাচলে পৌঁছিয়া চৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণের লীলাস্থল দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। তখন নীলাচলে চৈতন্যদেবের সঙ্গী অধিকাংশই পরলোকগমন করিয়াছেন। কেবলমাত্র গোপীনাথ আচার্য্য, শিখি মাইতি, কানাই খুঁটিয়া প্রভৃতি কয়েকজন জীবিত ছিলেন। তাঁহারা নরোত্তমকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। গোপীনাথমন্দিরে বৃদ্ধ বৈষ্ণব মাথু গোঁসাইর সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কিছুদিন নীলাচলে থাকিয়া জগন্নাথ প্রভৃতি দর্শনকরতঃ নরোত্তম গৌড়ে ফিরেন। পথে বৃন্দাবনের সঙ্গী শ্যামানন্দকে দেখিবার জন্য নৃসিংহপুরে গমন করিলেন। শ্যামানন্দ ও তাঁহার শিষ্যগণ নরোত্তমকে পাইয়া পরম আনন্দিত হন। দুই একদিন নৃসিংহপুরে অবস্থান করিয়া নরোত্তম গৌড়ে যাত্রা করিলেন।

গৌড়ে পৌছিয়া নরোত্তমদাস সর্ব্বপ্রথমে শ্রীখণ্ডে যান। সেখানে প্রবীন বৈষ্ণব নরহরি সরকারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নরহরি দাস তখন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; তিনিও তাঁহার সঙ্গী রঘুনন্দন নরোত্তমকে পাইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। নরোত্তমও তাঁহাদিগকে দেখিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। নরহরি দাস শ্রীখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহার সেবা করিতেন। সেখানে এক রাত্রি বাস করিয়া নরোত্তম দাস যাজগ্রামে গমন করেন। তথায় বহুদিন পরে শ্রীনিবাস সহ মিলনে উভয়ের পরম আনন্দ হইল। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে গ্রন্থচুরির পর তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পরে এই প্রথম সাক্ষাৎ। শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজগ্রামে ফিরিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেছিলেন। বহু শিষ্য তাঁহার নিকট ভক্তিগন্থ অধ্যয়নের জন্য আসিতেন নরোত্তম তাহা দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। যাজগ্রামে দুই একদিন অবস্থান করিয়া নরোত্তম কাটোয়া যান। সেখানে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানে দাস গদাধর একটি গৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। গদাধর তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু শরীর অতিশয় জীর্ণ। তাঁহার সহযোগী যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী নরোত্তমকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। ঠাকুর মহাশয় অবসরমতে গদাধর দাসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কাটোয়ায় শ্রীচৈতন্যের কেশমুণ্ডনের স্থান, কেশব ভারতির সমাধি প্রভৃতি দর্শন করিয়া নরোত্তম পরদিন প্রভাতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্রার অভিমুখে অগ্রসর হন। একচক্রার সে সময়ে দৈন্যদশা হইয়াছিল। তথায় পৌছিয়া একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত নরোত্তমের সাক্ষাৎ হয়। তিনি সযত্নে নরোত্তমকে নিত্যানন্দের জন্মস্থান, ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি দেখাইলেন।

ভক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন স্বয়ং নিত্যানন্দ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে নরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

একচক্রা হইতে নরোত্তম খেতরি ফিরিয়া আসিলেন। আত্মীয় স্বজন গ্রামবাসীগণ তাঁহাকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইল। এখন হইতে নরোত্তম খেতরি থাকিয়া ভক্তিধর্ম্ম সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে সঙ্গীদিগকে লইয়া তিনি সঙ্কীর্ত্তনের দল গঠন করেন। নরোত্তম অতি সুগায়ক ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তিনি যখন সঙ্কীর্ত্তন করিতেন তখন মধু ক্ষরিত হইত। তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনে লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি একটি নূতন সুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহা গরানহাটা নামে বিখ্যাত। এখন হইতে বহু ভক্তিপিপাসু লোক নরোত্তমের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নরোত্তমের খুল্লতাত পুত্র সন্তোষ দত্ত তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রথম ও প্রধান। নরোত্তম দারপরিগ্রহ না করিয়া সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প জানাইলে, তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। সন্তোষ ক্রমে নরোত্তমের পরম অনুরাগী ভক্ত হন। নরোত্তমের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। এই সময়ে বলরাম মিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ যুবক নরোত্তমের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। নরোত্তম শূদ্র। ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিবার জন্য বলরাম মিশ্র ও নরোত্তমের উপর নানাপ্রকার সামাজিক উৎপীড়ন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা বিচলিত হন নাই।

অম্বিকা শ্রীখণ্ড কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ দেখিয়া খেতরিতে সে প্রকার বিগ্রহ স্থাপনের জন্য নরোত্তমের ইচ্ছা হয়।

নরোত্তমের জীবন-চরিত প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন যে এক রাত্রিতে শ্রীচৈতন্য স্বপ্নে প্রকাশিত হইয়া বলেন তাঁহাদের এক ধনী প্রজার ধানের গোলায় তাঁহার মূর্ত্তি আছে। সর্পের ভয়ে সেখানে কেহ যাইতে সাহস করেন না। সেখানে গিয়া মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া তাহা স্থাপন করিতে নরোত্তমের প্রতি আদেশ হয়। নরোত্তম তাহাই করিলেন। কিন্তু প্রেমবিলাস রচয়িতা বলরাম দাস বা নিত্যানন্দ দাস লিখিয়াছেন "নরোত্তম কর্ণিরকর আনাইয়া 'প্রিয়াসহ' চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। বলরাম দাস প্রাচীন গ্রন্থকার; নরোত্তমের সমসাময়িক। সম্ভবতঃ চৈতন্যবিগ্রহস্থাপন মহোৎসবের সময়ে তিনি খেতরিতে উপস্থিত ছিলেন। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী দেবী তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র তাঁহার শিক্ষাগুরু। খেতরীর মহোৎসব অন্তে বলরাম দাস জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবন গমন করেন। সুতরাং তাঁহার বিবরণই অধিক বিশ্বাসযোগ্য।

মূর্ত্তি প্রস্তুত হইলে নরোত্তম তাহার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। খেতরির ইতিহাসে ইহা এক বৃহৎ ব্যাপার। নরোত্তমের পিতার অগাধ সম্পত্তি। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন। নরোত্তম বিলাসে এ সময়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের নাম উল্লেখ আর দেখা যায় না। তৎপরিবর্ত্তে সন্তোষ দত্ত সমুদয় আয়োজন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। যিনি হউন এই মহোৎসবে খেতরি রাজকোষের অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। নরোত্তমের ইচ্ছানুসারে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রধান মন্ত্রী। নরোত্তম প্রতিষ্ঠাকার্য্যের ভার তাঁহার উপর দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই

খেতরিতে আসিয়া সমুদয় কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার লন। নরোত্তমের বৃন্দাবনের বন্ধু শ্যামানন্দও এতদুপলক্ষে সশিষ্য উৎকল হইতে আসিয়া উৎসবের কার্য্যে সাহায্য করেন। গৌড়দেশের সকল প্রধান প্রধান বৈষ্ণব এই মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। খড়দহ হইতে নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী দেবী, শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত আচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ ও গোপাল মিশ্র, শ্রীবাস আচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, অম্বিকা হইতে হৃদয়চৈতন্যপ্রমুখ প্রাচীন মহাত্মগণ এই উৎসব উপলক্ষে খেতরি আসিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী কাটোয়া, যাজপুর, শ্রীখণ্ড, বুধরি, কাঞ্চনগড়িয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু বৈষ্ণবের সমাগম হইয়াছিল। এই সকল বৈষ্ণবসমাগমে কয়েকদিন খেতরিতে প্রেম ও আনন্দের লহরী উঠিয়াছিল। খেতরি ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোকেরা এই আনন্দ তরঙ্গে মাতিয়া ছিল। বোধ হয় বৈষ্ণব ইতিহাসে এত বড় মহোৎসব আর হয় নাই।

ফাল্গুন মাসের শুক্লাপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে খেতরির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়। শুক্লা পঞ্চমী হইতে মঙ্গলবাদ্য সহকারে উৎসবের সূচনা হয়। রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীদাস গোকুলানন্দ, গোবিন্দ কবিরাজ প্রমুখ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যগণ ইতিপূর্ব্বেই যাজগ্রাম, বুধরি কাঞ্চনগড়িয়া হইতে তথায় আগমন করেন। বলরাম মিশ্র প্রভৃতি নরোত্তমের শিষ্যগণের সহিত তাঁহাদের উপরে নিমন্ত্রিত মহাত্মাগণের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্য্যার ভার অর্পিত হয়। অতিথিগণের বাসস্থানের জন্য অনেক নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে বৈষ্ণবগণ যেমন আসিতে লাগিলেন, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে স্থান দিয়া এক এক জন লোকের উপরে তাঁহাদের পরিচর্য্যার ভার দেওয়া হইল। এইরূপে বৈষ্ণবগণসহ জাহ্নবীদেবীর তত্ত্বাবধানের ভার রামচন্দ্র কবিরাজের উপর,

শ্রীপতি ও শ্রীনিধির ভার শ্রীবাস আচার্য্যের উপর, অম্বিকার মহান্ত হৃদয়চৈতন্যের ভার শ্যামানন্দের উপর, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের ভার গোবিন্দ কবিরাজের উপর, কাটোয়ার যদুনন্দনের ভার ভগবান কবিরাজের উপর, আকাই হাটের কৃষ্ণদাস প্রভৃতির ভার বল্লবীকান্তের উপর, শ্রীচৈতন্য দাস প্রভৃতির ভার শ্রীনৃসিংহ কবিরাজের উপর, রঘুনাথ আচার্য্যাদির ভার কবি কর্ণপুরের উপর অর্পিত হইল। স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রত্যেক বাসায় গমন করিয়া বৈষ্ণবগণের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। জাহ্নবীদেবীর আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। তিনি পথে সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর, অম্বিকা, নবদ্বীপ, আকাইহাটা প্রভৃতি স্থান হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট খেতরির মহোৎসবের সংবাদ পাইয়া ঐ সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব মহোৎসবে যোগ দিতে খেতরি গমন করেন। নরোত্তম দাস ও তাঁহার ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত বহু সম্মানে সকলকে গ্রহণ করেন। তাঁহারা সমাগত মহান্তগণকে নববস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিলেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সকলে অতি প্রত্যূষে স্নানাদি সমাপন করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য সর্ব্বাগ্রে জাহ্নবী দেবী ও তৎপরে অন্যান্য মহান্তগণকে উৎসব প্রাঙ্গনে আগমনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সুবিস্তৃত উৎসব প্রাঙ্গণ বহুমূল্য চন্দ্রাতপ, নারিকেল, কদলীবৃক্ষ বিবিধ লতা ও পুষ্পে পূর্ব্বেই সুসজ্জিত হইয়াছিল। মন্দির সম্মুখে মহান্তগণের জন্য আসন ছিল। তাঁহারা যথাসময়ে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলেন। জাহ্নবী দেবীর জন্য এক পার্শ্বে নিভৃতে স্থান করা হইয়াছিল। তাঁহার ও অন্যান্য মহান্তগণের অনুমতি লইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হন। পৃথক পৃথক সিংহাসনে ছয়টী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বিগ্রহগুলির নাম রাখা হইল শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধা-

রমণ। ইহাদের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গই প্রধান। গৌরাঙ্গের সঙ্গে লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্ত্তিও ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের অভিষেকান্তে সে গুলিকে রত্নাবরণে সজ্জিত করেন। রূপ গোস্বামী প্রণীত প্রণালী অনুসারে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অভিষেকান্তে শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের আরতি করেন। তৎপরে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যের দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। এই সকল সমাপ্ত হইলে মহান্তগণের আদেশ অনুসারে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নরোত্তম তাঁহার সঙ্গীগণের সহিত মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করেন। সেদিনকার সঙ্কীর্ত্তন প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। নরোত্তম ও তাঁহার সঙ্গীগণের অপূর্ব্ব সুললিত কণ্ঠস্বর, দেবী দাসের খোলবাদ্য, নানা স্থানের ভক্তগণের সমাবেশ এই সব মিলিয়া সেদিন নব মন্দির প্রাঙ্গনে অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। ভক্তগণ ভাবে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, যেন নবদ্বীপের শ্রীবাসপ্রাঙ্গনে শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন। ভাবুক ভক্তগণ কল্পনায় মনে করিলেন শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্য্য গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে সেখানে নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য চলিল। তৎপরে ফাগুখেলা আরম্ভ হইল। মহান্তগণ আবির লইয়া বিগ্রহ ও পরস্পরের অঙ্গে জড়াইয়া দিলেন। সে আর এক আনন্দের তরঙ্গ। সন্ধ্যাকালে পুনরায় আরতি ও তৎপরে শ্রীচৈতন্যের জন্মলীলার উৎসব হইল। এই প্রকারে সারাদিন উৎসব চলিল। অনেক রাত্রিতে সকলে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। পরদিন জাহ্নবী দেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া মহান্তগণকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিলেন। যথা সময়ে বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। মধ্যাহ্নে মহান্তগণকে গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গনে সারি সারি বসান হইল। জাহ্নবী দেবী স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। সকলের আহারান্তে তিনি আহার করিলেম। ভক্তগণ আরও একদিন

খেতরিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহাদের স্ব স্ব বাসায় আহারাদির আয়োজন হইয়াছিল। সন্তোষ দত্ত তাঁহাদের প্রত্যেককে নব বস্ত্র মুদ্রাদি উপঢৌকন দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সন্ধ্যাকালে গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে পুনরায় সঙ্কীর্ত্তন হইল। পরদিন প্রাতঃকালে বৈষ্ণবগণের খেতরি পরিত্যাগের সময় স্থির হইয়াছিল। আসন্ন বিচ্ছেদের জন্য ভক্তগণের হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত। সঙ্কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবগণ স্ব স্ব বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে তাঁহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভক্তমণ্ডলীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বৈষ্ণবগণ অবশেষে ব্যথিত অন্তরে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্তোষ দত্তের আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বেই পদ্মা পার হইবার জন্য নৌকা প্রস্তুত ছিল। পদ্মা পার হইয়া বৈষ্ণবগণ অপরপারে স্নান করিলেন। তাঁহাদের জলযোগের জন্য পূর্ব্বেই সেখানে মিষ্টান্নাদি প্রেরিত হইয়াছিল। জলযোগান্তে বৈষ্ণবগণ যাত্রা করিলেন। বুধরি গ্রামে সেদিনও মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। বুধরি হইতে বৈষ্ণবগণ স্ব স্ব গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে খেতরির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হয়। জাহ্নবীদেবী আর দুইদিন খেতরি থাকিয়া তথা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্যামানন্দপ্রমুখ নরোত্তম ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সঙ্গীগণ আরও কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবলমাত্র রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তমের সঙ্গে খেতরি রহিলেন।

এখন হইতে রামচন্দ্র কবিরাজ খেতরিতেই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র স্ত্রীকে দেখিতে চাহিতেন না। নরোত্তম দাসের সহিত খেতরিতে সাধন ভজনে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার

পত্নী অতিশয় দুঃখিত হইতেন। তিনি একবার স্বীয় পতিকে গৃহে পাঠাইবার জন্য নরোত্তমকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। নরোত্তমের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রামচন্দ্র গৃহে আসিলেন বটে, কিন্তু একদিনও সেখানে থাকিতে পারিলেন না। নরোত্তমের বিরহে অস্থির হইয়া খেতরি প্রত্যাগমন করেন। নরোত্তমও রামচন্দ্রের অদর্শনে গভীর বেদনা অনুভব করিতেন। এই প্রকার বন্ধুতার দৃষ্টান্ত মানব সমাজে বিরল। রামচন্দ্রের অদর্শনে নরোত্তমের যে অবস্থা হইয়াছিল তাঁহার রচিত কবিতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন :—

রামচন্দ্র কবিরাজ সেই সঙ্গে মোর কাজ
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন
নরোত্তম তবে হবে ধন্য॥

রামচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া নরোত্তমের যে অবস্থা হইয়াছিল নরোত্তম বিলাসে তাহা এইরূপ বর্ণিত আছে :—

শ্রীঠাকুর মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
নির্জ্জন বনেতে গিয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
ওহে রামচন্দ্র মোরে গেলা কোথা ছাড়ি।
এত কহি কণ্ঠ রুদ্ধ রহে ভূমে পড়ি॥

* * * *

দূরে থাকি দেখি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
পড়িয়া আছেন মহাশয় মহীতলে॥
চতুর্দ্দিগে বেড়ি সবে করয়ে ক্রন্দন।
কতক্ষণে মহাশয় হইলা চেতন॥ দশম বিলাস।

নরোত্তম দাস কেবল মাত্র অসাধারণ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন না, তাঁহার

মানবপ্রীতিও অদ্ভুত। তাঁহাকে প্রেমের অবতার বলা যাইতে পারে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিতও তাঁহার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার অদর্শনে নরোত্তম যে বেদনা পাইয়াছিলেন স্ব-রচিত কবিতায় তাহা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস আছিনু যাঁহার পাশ
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা
দুঃখে জিউ করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥

খেতরির মহোৎসবের পরে নরোত্তম ঠাকুর আরও গভীর সাধনে নিযুক্ত হইলেন। এখন হইতে তিনি আর রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন না। খেতরির প্রান্তভাগে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত তথায় দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এখানে তাঁহারা নির্ব্বিবাদে ভক্তিগ্রন্থপাঠ, ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্কীর্ত্তনে সময় কাটাইতেন। দিনান্তে একবার গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গনে আসিয়া বিগ্রহ দর্শন করিয়া যাইতেন। নানাস্থান হইতে ব্যাকুলাত্মা ধর্ম্মপিপাসু লোকগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিতেন। অনেকে নরোত্তমের নিকটে দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইতেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নরোত্তম অনেককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ ছিলেন। নরোত্তমের ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের মধ্যে হরিরাম ও রামকৃষ্ণই প্রধান। মুর্শিদাবাদ জেলায়

গোয়াস নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে তাঁহাদের জন্ম। তাঁহাদের পিতার নাম শিবাই আচার্য্য। তিনি শাক্তধর্ম্মাবলম্বী সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। প্রতি বৎসর মহা ধুমধামে তাঁহার গৃহে দুর্গাপূজা হইত। এ যাত্রা পূজায় বলিদানের জন্য দুই ভাই ছাগ মহিষাদি ক্রয় করিতে পদ্মাপার আসিয়াছিলেন। খেতরির ঘাটে নরোত্তম ও রামচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ভক্তদ্বয় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে করিতে স্নানে যাইতেছিলেন। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রসঙ্গ শ্রবণে মুগ্ধ হন এবং ছাগমহিষাদি ছাড়িয়া দিয়া নরোত্তমের নিকট ভক্তিধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করেন। নরোত্তম সাদরে তাঁহাদিগকে গৃহে আনিয়া উপদেশ দেন। ক্রমে দুই ভ্রাতা ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে নরোত্তম রামকৃষ্ণকে এবং রামচন্দ্র হরিরামকে ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষা দেন। কয়েকদিন খেতরিতে অবস্থান করিয়া হরিরাম ও রামকৃষ্ণ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহাদের পিতা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষার কথা শ্রবণকরতঃ ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্রদ্বয়কে বহু তিরস্কার করিলেন, ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া শূদ্রের নিকটে দীক্ষা গ্রহণের জন্য শিবাই আচার্য্য এবং স্থানীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে পরাস্ত করিলেন। শিবাই আচার্য্য তখন মুরারি নামক জনৈক মিথিলা নিবাসী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে আনয়ন করিলেন। কিন্তু হরিরাম ও রামকৃষ্ণ তাঁহাকেও পরাস্ত করিলেন। এই ব্যাপারে ব্রাহ্মণসমাজে মহা আন্দোলন উঠিল। শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে দীক্ষার অপরাধে নরোত্তমকে বহু আক্রমণ করা হইয়াছিল। এজন্য নরোত্তম, হরিরাম ও রামকৃষ্ণকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা অবিচলিতচিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন। হরিরাম,

রামকৃষ্ণ স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে হরিরাম ও রামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তে নিকটবর্ত্তী গম্ভীলা গ্রাম নিবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামক একজন সচ্চরিত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ নরোত্তমের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময়ে নরোত্তম গঙ্গাস্নানের জন্য গম্ভীলা আগমন করেন। সুযোগ পাইয়া গঙ্গানারায়ণ নরোত্তমের নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। নরোত্তম ব্রাহ্মণগণের বিরোধের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন। তদুত্তরে গঙ্গানারায়ণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রশংসনীয় সৎসাহসের পরিচয়।

"চক্রবর্ত্তী কহে তুমি কৃপা কর যারে।
সে কি হেন ভক্তিহীন বিপ্রে ভয় করে॥"

(নঃ, বিঃ, ১৫৪ পৃঃ।)

নরোত্তম বলিলেন এখন এই প্রসঙ্গ থাক, আমাকে আজই খেতরি যাত্রা করিতে হইবে। যদি তুমি প্রকৃতই দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাক তাহা হইলে খেতরি আইস, সেখানে তোমার দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবে। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী পরদিনই খেতরি যাত্রা করিলেন এবং সেখানে নিষ্ঠার সহিত নরোত্তমের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এই সময়ে জগন্নাথ আচার্য্য নামক আর একজন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ নরোত্তমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি নিষ্ঠাবান শক্তি উপাসক ছিলেন। লিখিত আছে ভগবতীর আদেশে তিনি নরোত্তমের নিকট দীক্ষা প্রার্থী হন। তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকেও দীক্ষা দেন।

এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণের শূদ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাতে হিন্দুসমাজে মহা হুলস্থুল হয়। ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধ হইয়া প্রতাপশালী রাজা নরসিংহের নিকট গিয়া বলিলেন, নরোত্তম শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দীক্ষা দিতেছে। আমাদের জাতিধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। আপনি আমাদের নেতা হইয়া চলুন; আপনার সম্মুখে আমরা তাহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া হিন্দুসমাজ রক্ষা করিব। নরসিংহ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ খেতরির সন্নিকট আসার পর ভীত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

রাজা নরসিংহ অধ্যাপকদিগের নেতা রূপনারায়ণকে লইয়া পরদিন প্রাতে খেতরি গমন করিলেন। সেখানে নরোত্তমকে দর্শন করিয়া উভয়েই বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন এবং আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। নরোত্তম তাঁহাদিগকে কিছুদিন তথায় রাখিয়া ভক্তিধর্ম্মে উপদেশ এবং অবশেষে দীক্ষা দেন। এখন হইতে রাজা নরসিংহ নরোত্তমের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইলেন। তাঁহার মহিষী রূপমালাও নরোত্তমের নিকটে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিদিন নিয়ম করিয়া লক্ষনাম জপ করিতেন।

রাজা নরসিংহ ব্যতীত আরও কয়েকজন প্রতাপশালী জমীদার এই সময়ে নরোত্তমের শিষ্য হন। এই সকল জমীদাররা অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিলেন। কিন্তু নরোত্তমের শিষ্য হইয়া তাঁহাদের জীবনে পরিবর্ত্তন আসে। এই সময়ে চাঁদরায় নামক একজন মহা প্রতাপশালী জমিদার এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অধীনে বহু দস্যু ছিল।

"মহাবলবান চান্দরায় জমিদার।
দস্যুর প্রধান অতিশয় দুষ্টাচার॥"

(নঃ বিঃ ১০ম বিলাস।)

তাঁহার ভয়ে লোকে কাঁপিত। সম্ভবতঃ তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন। কিরূপে বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ হয় তাহা বোঝা যায় না। নরোত্তম বিলাসে লিখিত আছে তাঁহার দুর্বৃত্ততার জন্য দেবী তাঁহাকে ব্রহ্মদৈত্য দ্বারা ক্লেশ দেন।

"অতি ক্রোধযুক্তা দেবী দেখিয়া দুর্ণীত।
ব্রহ্মদৈত্য দ্বারে দুঃখ দিলা যথোচিত॥
পুনঃ সেই দেবী দেখি জীবন সংশয়।
আজ্ঞা কৈলা কর নরোত্তম পদাশ্রয়॥
নরোত্তম মহাশয় অতি দয়াবান।
নরক হইতে তোরে করিবেন ত্রাণ॥
ঐছে স্বপ্নাদেশে চান্দরায় সেইক্ষণে।
লইলা শরণ মহাশয়ের চরণে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় দেখি মহা ক্লেশ।
নিজগুণে করিলা শ্রীমন্ত্র উপদেশ॥"

দশম বিলাস।

এই বিবরণে মনে হয় দুর্বৃত্ত চাঁদরায় বায়ুরোগগ্রস্থ হইয়াছিলেন। তৎকালীন বিশ্বাস অনুসারে লোকে মনে করিল তাঁহাকে ব্রহ্মদৈত্যে আশ্রয় করিয়াছে। সম্ভবতঃ নরোত্তমের কৃপায় রোগমুক্তি হওয়ায় তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ জন্মে। নরোত্তমের উপদেশে তাঁহার জীবনে পরিবর্ত্তন আসে। এখন হইতে তিনি দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে চলিতে লাগিলেন। কোন কারণে প্রদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। সেখানে তাঁহার প্রতি নানা অত্যাচার হইয়াছিল। চাঁদরায় সহিষ্ণুতার সহিত সে সকল সহ্য করেন। কথিত আছে মুসলমান শাসনকর্ত্তা চাঁদরায়কে হস্তীপদতলে

নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু হস্তী তাঁহাকে বধ না করিয়া পলায়ন করে। অবশেষে শাসনকর্ত্তা তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া চাঁদরায়কে মুক্তি দেন। কারামুক্ত হইয়া চাঁদরায় একেবারে খেতরি গমন করেন। সেখানে গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে নরোত্তমের পদতলে পড়িয়া অনেক ক্রন্দন করেন। তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। চাঁদরায়ের পূর্ব্ব অনুচরগণের মধ্যেও অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তে ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করে।

হরিচন্দ্র রায় নামে আর একজন দস্যু জমীদারও এই প্রকারে নরোত্তমের শিষ্য হইয়াছিলেন।

"হরিচন্দ্র রায় নামে দস্যু একজন।
গুণ শুনি লৈলা মহাশয়ের চরণ॥
দীক্ষামন্ত্র দিয়া তাঁরে করিলা উদ্ধার।
শেষে হরিদাস নাম হইল তাঁহার॥
হইলেন দুর্ল্লভ ভক্তির অধিকারী।
ত্যাগ কৈলা সে জলা পন্থের জমিদারী॥"

দশম বিলাস।

এইরূপে নরোত্তম ঠাকুর উত্তরবঙ্গে ভক্তিধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজগ্রাম হইতে খেতরী আগমন করিতেন। তিনি শেষবার যখন খেতরী আসিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রও আগমন করিয়াছিলেন। বুধরী প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে খেতরীতে একটী ক্ষুদ্র উৎসব হইয়াছিল। এই শ্রীনিবাসের শেষ খেতরী আগমন। ইহার পর তিনি বৃন্দাবন যান। এই সময়ে রামচন্দ্র কবিরাজও বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। তাঁহারা আর বঙ্গদেশে

ফিরেন নাই। অল্পদিনের মধ্যে উভয়েই তথায় দেহত্যাগ করেন।

ইহার পরে নরোত্তম দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। রামচন্দ্র ও শ্রীনিবাসের বিরহে তিনি অতিশয় বেদনা পাইয়াছিলেন। নরোত্তমের মৃত্যু সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে কিছু অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত আছে। নরোত্তমের জীবনচরিত লেখক নরহরি চক্রবর্ত্তী নরোত্তমবিলাসে লিখিয়াছেন শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার কিছুদিন পরে ঠাকুর মহাশয় গঙ্গা স্নানের জন্য গাম্ভীলা আগমন করেন। সেখানে গঙ্গাতীরে অকস্মাৎ তাঁহার জ্বর হইল। তিন দিন বাক্‌রোধের পরে তাঁহার দেহ প্রাণশূন্য হইল। শিষ্যগণ তাঁহাকে চিতায় উঠাইলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিল যেমন শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়াছিল তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইল; মৃত্যু সময়ে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মনামও লইতে পারিল না। এই প্রকার বিদ্রূপ বাক্য শুনিয়া গঙ্গানারায়ণ চিতার নিকট গিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, এই পাষণ্ডীগণ তোমার নিন্দা করিতেছে। নিজ-গুণে ইহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। গঙ্গানারায়ণের ব্যাকুল প্রার্থনায় ঠাকুর মহাশয় পুনরায় জীবিত হইলেন। এই বিবরণ প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। তবে এই পর্য্যন্ত হইতে পারে যে ঠাকুর মহাশয় কিছুক্ষণ মৃতবৎ থাকিয়া পুনরায় চেতনালাভ করিয়াছিলেন। নিন্দুক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া ভীত হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিল। তাহারা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। ঠাকুর মহাশয় তাহাদিগকে খেতরী আসিতে বলিয়া সেইদিনই খেতরী যাত্রা করেন।

ইহার পরেও তিনি আর কিছুদিন জীবিত ছিলেন। নিন্দুক

ব্রাহ্মণগণ খেতরী আসিলে তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপরে তিনি বুধরি হইয়া পুনরায় গাম্ভীলা গমন করেন। সেখানে গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গাজলে বসিলেন এবং রামকৃষ্ণ ও গঙ্গানারায়ণকে স্বীয় গাত্র মার্জ্জন করিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা গাত্রমার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিতেই তাঁহার দেহ দুগ্ধের ন্যায় গঙ্গাজলে মিশিয়া গেল।

"দোঁহে কিবা মার্জ্জন করিব পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিশাইলা গঙ্গার জলেতে॥"

নঃ বিঃ, একাদশ বিলাস।

এই ব্যাপারও অলৌকিক। পরবর্ত্তী সময়ে ভক্তগণের কল্পনা। কিন্তু ইহাতে নরোত্তমের মহত্ত্ব বর্দ্ধিত হয় নাই। তাঁহার মহত্ত্ব অসাধারণ ত্যাগ, অদ্ভুত বৈরাগ্য, অকপট ভক্তি, মধুমাখা সঙ্কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে ব্যাকুল উৎসাহে।

নরোত্তম একজন স্বভাব কবিও ছিলেন। তাঁহার সরল সুললিত পদাবলীর জন্য তিনি বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যেও উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক নরোত্তমের লিখিত বলিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সমাদৃত হয়। তন্মধ্যে নরোত্তম দাসের প্রার্থনা জনসাধারণের সু-পরিচিত। তাঁহার রচিত ৪৮টী প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলির ভাষা যেমন সুললিত ভাবও তেমনি উন্নত। পংক্তিতে পংক্তিতে গভীর ব্যাকুলতা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। একটি প্রার্থনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়ে কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে আমি হেরিব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ পদে হইব কাকুতি।
কবে আমি বুঝিব সে যুগল পিরীতি॥
রূপ রঘুনাথ পদে রহুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

এখানে দেখা যাইতেছে আজীবন সংসারত্যাগী কঠোর সাধক নরোত্তম দাস পুনরায় প্রার্থনা করিতেছেন "সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।" বৈরাগ্যের কি উচ্চ আদর্শ! মতে ঐক্য না হইলেও নরোত্তমের এই উচ্ছ্বসিত ব্যাকুলতা পীপাসু হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অবসাদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম যেমন শীতকালের ফুলের মত অল্পদিনের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি শীঘ্রই ইহা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ইহার সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ভারতের অন্যান্য ধর্ম্মসংস্কারের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম কিছুদিন প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অবসাদ জগতের ধর্ম্মইতিহাসে একটী গভীর আক্ষেপজনক ঘটনা। ইহা জগতের জন্য আধ্যাত্মিক জীবনের একটী উচ্চ আদর্শের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল। তাহা প্রেমভক্তি। ভগবান মানবাত্মাকে ভালবাসেন। মানব ভগবানকে ভালবাসে। শুধু তাহাই নহে, ভগবান মানবকে ভালবাসেন। এই ভালবাসা প্রকাশের জন্য রাধা-কৃষ্ণের রূপক কল্পনা। কৃষ্ণ অর্থাৎ পরমাত্মা, রাধা অর্থাৎ জীবাত্মার জন্য ব্যাকুল। ভগবানের অদ্ভুত ভালবাসা অনুভব করিয়া মানব তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইবে ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই শিক্ষা জগৎকে দেওয়া দূরে থাকুক, বৈষ্ণব মণ্ডলীতেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। অল্পদিনের মধ্যেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ম্লান ও বিকৃত হইয়া পড়িল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অবসাদের বীজ ইহার শিক্ষা ও সাধনার মূলেই নিহিত ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ধর্ম্মসাধনে ভাবকে উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং গভীর জ্ঞানী হইলেও উত্তরকালে জ্ঞানকে অবহেলা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহা একটি প্রধান ভুল। ভক্তি

ধর্ম্মরাজ্যে বহু মূল্যবান পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অতি সহজেই বিকৃত হইয়া যাইতে পারে। সুকোমল পুষ্পের ন্যায় সতর্কে রক্ষা না করিলে ভক্তি ম্লান হইয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে তাহাই হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের মধুরভক্তি পরবর্ত্তী সময়ে ভাবুকতাতে পরিণত হইয়াছিল। ভক্তি ভাবপ্রধান। কিন্তু ভাবই ইহার জীবন নয়, বাহ্য প্রকাশ মাত্র। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ভক্তি প্রাণশূন্য হইয়া কৃত্রিম ভাবুকতাতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভক্তি অতি সুদুর্ল্লভ; বহু ভাগ্যে, বহু সাধনায় তাহা লাভ হয়। উত্তরকালে সাধারণ বৈষ্ণবগণ সে সাধনা না করিয়াই ভক্তির বাহ্য প্রকাশ অনুকরণ করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গীগণ ভক্তিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া পরবর্ত্তী সময়ে অনেক বৈষ্ণব কৃত্রিম 'দশায়' সেইরূপ ভাব দেখাইত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান সাধন সঙ্কীর্ত্তন। ধর্ম্মভাব উদ্রেকের পক্ষে সুললিত সঙ্কীর্ত্তন একটি প্রধান সহায়। বৈষ্ণবগণ খোল করতাল বাদ্য সহকারে সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মভাব জাগরণের একটি উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যদি হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া কেবলমাত্র কর্ণের তৃপ্তি সাধন করে তাহা হইলে তাহার সদ্ব্যবহার হয় না। উত্তরকালে বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তন তাল, লয়, মানে অধিক হইতে অধিকতর সুললিত হইয়াছিল। খোল করতালের বাদ্যে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হৃদয়কে স্পর্শ নাও করিতে পারে। সঙ্কীর্ত্তনের প্রাণ ভক্তি। উত্তরকালে সঙ্কীর্ত্তন কেবলমাত্র ভক্তিবর্জ্জিত সুললিত সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট জিনিস সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। ভাব ও ভক্তি স্বর্গের জিনিষ। কিন্তু ইহা অল্পেই ম্লান হইয়া যাইতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর লক্ষ্য অতি

উচ্চ ছিল। কিন্তু এই লক্ষ্য সাধনের জন্য যে সংগ্রাম চাই তাহা সহজ-সাধ্য নহে। শ্রীচৈতন্যের ব্যাকুলতা, নিত্যানন্দের বালসুলভ সরলতা, রামানন্দের পবিত্রতা, রূপসনাতনের নিষ্ঠা, নরোত্তমের বৈরাগ্য সাধারণের মধ্যে আশা করা যায় না। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথমদিকে যেরূপ বহুসংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত ও সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী কালে সেরূপ দেখা যায় না। যোগ্য নেতার অভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মণ্ডলী ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চ্চার অভাব বৈষ্ণবধর্ম্মের অবসাদের একটি প্রধান কারণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী জ্ঞানকে অবজ্ঞা করিয়া মহাভ্রম করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে ভক্তির স্থান উচ্চ হইলেও জ্ঞানকে অবজ্ঞা করা যায় না। জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে পরিণত হইয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে জ্ঞানকে উপেক্ষা করার কুফল অল্পসময়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মণ্ডলীতে জ্ঞানকে শুধু অবহেলা করা হয় নাই, কিন্তু নিন্দা করা হইয়াছিল। ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া বৈষ্ণব আচার্য্যগণ জ্ঞানকে হীন করিয়াছিলেন। ইহার ফল হইয়াছিল যে অল্পদিনের মধ্যেই বৈষ্ণবধর্ম্ম অবতার বাদ, নরপূজা, গুরুবাদ প্রভৃতি অনর্থে জড়িত হইয়া পড়িল। অন্ধ ভক্তি হইতে বিবিধ কুসংস্কারের জন্ম হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গ্রহণ ও প্রচার করা হইয়াছিল। তাঁহাদের মৃত্যু হইতে না হইতেই তাঁহাদের মূর্ত্তি-পূজা আরম্ভ হইয়াছিল। এইখানেই শেষ নয়। বৈষ্ণব গুরুদিগকেও ঈশ্বরোচিত পূজা দেওয়া হইত। গুরুগণকে ঈশ্বর বা শ্রীচৈতন্যের অবতার বলিয়া মনে করা হইত। তাঁহাদের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইত না। অন্ধভক্তিতে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের ন্যায় পূজা করা হইত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে গুরুবাদের বিষময় ফল পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হয়। জ্ঞানের অবজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে শিক্ষার প্রতি অমনোযোগ আসিয়াছিল। অবশ্য সে যুগই অন্ধকারের যুগ। সে সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শিক্ষার অভাব। কিন্তু বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ইহা অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। শিক্ষার অভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব মণ্ডলীর অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ। বিশেষতঃ শিক্ষার অভাবে ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ দুর্গতি হইয়াছে। নানা শ্রেণীর নানা অবস্থার লোককে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী এখনও উন্নত হইতে পারে।

জ্ঞানের অভাব অপেক্ষা নৈতিক শিথিলতা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর অধিক অনিষ্ট করিয়াছিল। বৈষ্ণবগণ ভাবুকতাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া একদিকে যেমন জ্ঞানকে অবহেলা করিয়াছিলেন সেইরূপ নৈতিক বিশুদ্ধতার দিকেও মনোযোগ দেন নাই। স্বয়ং চৈতন্যদেবের নৈতিক অনাবিলতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ সে দিকে তেমন মনোযোগ দেন নাই। আমরা দেখিয়াছি স্ত্রীলোকের সাংস্রবে বাক্যালাপের জন্য শ্রীচৈতন্য ছোট হরিদাসকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভক্তগণের জীবনে উচ্চ নৈতিক আদর্শ দেখিতে চাহিতেন। কিন্তু উত্তরকালে সে আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের কঠোর বৈরাগ্য পরবর্ত্তী সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মণ্ডলীতে স্থান পায় নাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈরাগ্যের ধর্ম্ম না হইয়া ভোগের ধর্ম্ম হইয়াছিল। বৈষ্ণবগণ গৃহ পরিবারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। শীঘ্রই বৈরাগ্যের আদর্শ ভুলিয়া তাঁহারা গৃহসুখে মগ্ন হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব নেতাগণ নৈতিক

আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। স্বয়ং নিত্যানন্দ দুইটী বিবাহ করিলেন এবং অলঙ্কারাদি বহুমূল্য বিলাস সামগ্রী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে সাধারণ বৈষ্ণবেরাও ভোগের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল। গুরুগণ অসঙ্কোচে শিষ্যদিগের নিকট হইতে উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিতেন। উত্তরকালে এই প্রথার অতিশয় অপব্যবহার হইয়াছিল। ক্রমে দুর্নীতি অসদাচার, বিলাসিতা, সাংসারিকতা প্রভৃতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী কলুষিত হইয়াছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নৈতিক অধঃপতনের একটি কারণ বৈষ্ণব সাহিত্য। প্রেমভক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিগণ অতিমাত্রায় শারীরিক উপমার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহারা অবাধে রক্তমাংসের ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ভক্তগণ যেভাবেই তাহা গ্রহণ করুন, সাধারণ লোকের নিকট তাহা বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে কাম ও প্রেমের ব্যবধান রক্ষিত হয় নাই। এইজন্য বৈষ্ণব সাহিত্য অশ্লীলতায় দূষিত। অসচ্চরিত্র যুবকগণের মুখে বৈষ্ণবকবিতা অতি কদর্য্যভাবে ব্যবহৃত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য রক্তমাংসের ভাষা অবলম্বন করিয়া নৈতিক আদর্শের বিশেষ খর্ব্ব করিয়াছে। তাহা দ্বারা বৈষ্ণবমণ্ডলীর অধঃপতন সহজ হইয়াছে। ধর্ম্মের পথ অতি তীক্ষ্ণ, শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়। দৈহিক ভোগ মানব চরিত্রে স্বভাবতই অতি প্রবল। ধর্ম্মের কার্য্য তাহাকে সংযত করা। তৎপরিবর্ত্তে যদি তাহার প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহার ফল ত বিষময় হইবেই। নীতিই সমাজের প্রাণ। অতি সন্তর্পণে নৈতিক আদর্শ সমাজ মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক। কার্য্যে, ভাষায়, ভাবে,

ইঙ্গিতে নৈতিক পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হইতে দিলে সমাজের ঘোর অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী এই সহজ সত্যের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই। তাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে নৈতিক আবিলতা আসিয়াছিল। চরিত্রহীন পুরুষ ও নারীদিগকে অবাধে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। উপযুক্ত সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা হয় নাই। অশিক্ষিত রিপু-পরতন্ত্র লোকদিগকে অযথা স্বাধীনতা দেওয়া নিরাপদ নহে। এই শ্রেণীর লোককে দৈহিক উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীতাদি, অসঙ্কোচে গান ও শ্রবণ করিতে দিবার সুবিধা দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের অপবিত্রতার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর সামাজিক আবহাওয়া কলুষিত হইয়া পড়িল।

একদিকে যেমন সকল শ্রেণীর লোকদিগকে অবাধে বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে গ্রহণ করা হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনি অযোগ্য লোকদিগকে শাসন ও সংস্কারের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবনেতাগণ দীন, পতিত, অধম মূর্খদিগের উদ্ধারের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা অতীব প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মধ্যে অধম পতিত পাপীগণের সংশোধন ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। মানবচরিত্র অতি জটিল। শুভক্ষণে মানব হৃদয়ে সাধু সঙ্কল্প আসিতে পারে, কিন্তু তাহা রক্ষা করা সহজসাধ্য নহে। জগাই মাধাইয়ের পরিবর্ত্তন এক মুহূর্ত্তে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে কঠোর শাসন ও সাধনে তাঁহারা পরম সাধু হইতে পারিয়াছিলেন। দৃঢ় সঙ্কল্প ও সাবহিত সাধনার অভাবে পুরাতন অভ্যাস সহজেই পুনরাগমন করে। বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে ইহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। তাঁহারা অধম পতিতের

জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যুগের ভক্তগণ তাহাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জগাই মাধাইয়ের উন্নতির জন্য উপযুক্ত শাসন দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের মনে গভীর অনুতাপ আসিয়াছিল। প্রথম জীবনে যে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন তাহা স্খালনের জন্য অন্তরে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। তাহা সম্ভব না হওয়াতে চৈতন্যদেব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন গঙ্গাতীরে বসিয়া যাঁহারা স্নান করিতে আসিবেন সকলের সেবা করিবে। নিত্যানন্দ দস্যুদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন—

শুন বিপ্র ! যতেক পাতক কৈলা তুমি।
আর যদি না কর সে সব নিলুঁ আমি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া সব তুমি, না করিহ আর॥
ধর্ম্ম পথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ।
যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথ সভারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

চৈঃ ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

উত্তরকালে এই প্রকার শাসনের ব্যবস্থা হয় নাই। উন্মুক্ত দ্বার-পথে হিন্দু সমাজের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা অবাধে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কিন্তু অনুতাপানলে দগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে বৈষ্ণব-মণ্ডলী সে অনুপ্রাণনাশক্তি হারাইয়াছিল। প্রথম যুগে যেমন দলে দলে পূতচরিত্র অনুপ্রাণনাময় ভক্তের আবির্ভাব হইয়াছিল উত্তরকালে

সে স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নরোত্তমদাসের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে আর অধিক প্রভাপশালী আচার্য্য ও ব্যাকুলহৃদয় ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে বৈষ্ণবমণ্ডলী হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণবসমাজে আধ্যাত্মিক অগ্নি ম্লান হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনারাশি আসিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক প্রভাব আরও খারাপ করিয়াছিল। ইহারা কোন আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীতে যোগদান করে নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সামাজিক স্থান পাইবার জন্য নূতন সমাজে যোগ দিয়াছিল। ইহাতে বৈষ্ণবমণ্ডলীর নৈতিক আবিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

জ্ঞান ও নীতির অভাব ব্যতীত ভাবের সাধনায় বৈষ্ণবমণ্ডলী চরিত্রের দৃঢ়তায় হীন হইয়াছিল। বৈষ্ণবগণ যে পরিমাণে হৃদয়ের কোমল গুণগুলি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, চরিত্রের দৃঢ়তা অর্জ্জনে সেই পরিমাণ মনোযোগ দেন নাই। চরিত্রের পূর্ণতার পক্ষে একদিকে যেমন কোমলভাবের প্রয়োজন অপরদিকে দৃঢ়তারও সেই ভাবে আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন ভারতের জাতীয় দুর্ব্বলতা ত ছিলই, এই সমুদয় মিলিত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের শীঘ্রই অবনতি আনিয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তমদাসের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম দ্রুত-গতিতে অবনতির দিকে চলিয়াছিল। তবে অন্ধকারের মধ্যে আলোকরশ্মি বিরল নহে। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সময়ে সময়ে অনেক সাধুর জন্ম হইয়াছিল। এখনও বৈষ্ণবমণ্ডলী নিতান্ত অবহেলা পাত্র নহে। বিশেষতঃ সম্প্রতি বৈষ্ণবমণ্ডলীর উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।